পূর্বতনী

নরেন্দ্র নাথ মিত্র

গ্রন্থপীঠ

প্রথম প্রকাশ—ফাল্গুন, ১৩৬৫

প্রকাশক—দেবী প্রসাদ সরকার
গ্রন্থপীঠ
১৪৪, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্
কলিকাতা-৬

মুদ্রাকর—শ্রীভোলানাথ হাজরা
রূপবাণী প্রেস
৩১, বাদুড়বাগান ষ্ট্রীট্
কলিকাতা-৯

প্রচ্ছদ শিল্পী—বিভূতি সেনগুপ্ত
ব্লক ও প্রচ্ছদ মুদ্রণ—
ভারত ফোটোটাইপ স্টুডিও
৭২।১, কলেজ ষ্ট্রীট, কলি-১২

বাঁধাই—
চক্রবর্তী বাইণ্ডিং ওয়ার্কস্
১০১, বৈঠকখানা রোড, কলি-৯

দুই টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা

শ্রীঅন্নদাশঙ্কর রায়
শ্রদ্ধাস্পদেষু

॥ লেখকের অন্যান্য বই ॥

অসমতল, হলদেবাড়ি, দ্বীপপুঞ্জ, উল্টোরথ, পতাকা, অক্ষরে অক্ষরে, চড়াইউৎরাই, দেহমন, তুরভাষিণী, শ্রেষ্ঠগল্প, সঙ্গিনী, গোধূলী, চেনামহল, কাঠগোলাপ, অসবর্ণা, ধূপকাঠি, মলাটের রং, অনুরাগিণী, সহৃদয়া, রূপালী রেখা, দীপান্বিতা, নিরিবিলি, ও পাশের দরজা, একূল ওকূল, বসন্তপঞ্চম, শুক্লপক্ষ, কন্যাকুমারী, মিশ্ররাগ, উত্তরণ, অনমিতা, সুখদুঃখের ঢেউ।

পূর্বতনী

ট্রেণটা যখন জলগাঁও ষ্টেশনে এসে পৌছল সন্ধ্যা ঘোর হয়ে গেছে। বেশি তাড়াহুড়ো করবার দরকার ছিল না। গাড়িটা এখানে মিনিট দশেক দাঁড়াবে। মালপত্রও এমন কিচ্ছু নেই যে কুলি ডেকে সেগুলি নামাতে সময় লাগবে। সুটকেসটা হাতে নিয়ে অমরেশ ধীরে সুস্থেই নামতে পারত। কিন্তু তার সঙ্গে সস্ত্রীক যে প্রৌঢ় ভদ্রলোক এসেছেন তিনি একটু নার্ভাস ধরনের। ট্রেণে উঠবার আগে বিপুল-বাবুর ভয় পাছে তাঁকে ফেলে গাড়ি ছেড়ে দেয়। আবার যে ষ্টেশনে নামবেন তার দুটি ষ্টেশন আগে থেকে তিনি তৈরি হতে থাকেন, তখন তাঁর আশঙ্কা, পাছে যথাস্থানে নামিয়ে না দিয়ে তাঁকে নিয়েই গাড়ি চলে যায়। ভদ্রলোকের স্ত্রী অত অবুঝ নন। কিন্তু বিপুল বাবু একাই একশ। কখন যে কোন কাণ্ড ঘটিয়ে বসবেন তার ঠিক নেই। এই দেড়দিনের জার্নিতে গাড়িব মধ্যে অনেক জ্বালাতন করেছেন। ট্রেণের জানলা তুলতে গিয়ে আঙুলে চোট খেয়েছেন; মাটির ভাঁড়ে চা খেতে গিয়ে অমরেশের জামা নষ্ট করেছেন। অনেক কীর্তি কবেছেন ভদ্রলোক। ওঁর স্ত্রী অবশ্য আদর আপ্যায়নে, ক্যারিয়ার থেকে খাবার বার করে খাইয়ে নানা গল্পগুজব করে পুষিয়ে দিয়েছেন। শেষ পর্যন্ত এই পথের সঙ্গীদের ছাড়তে পারেনি অমরেশ। ভদ্রলোকের স্ত্রীর অনুরোধ এড়াতে পারেনি। নিজের প্রোগ্রাম একটু অদল বদল করে একই সঙ্গে অজন্তা ইলোরা দেখতে সম্মত হয়েছে।

সেই অজন্তা দর্শনের জন্যেই জলগাঁয়ে নামতে হবে। এখানে একটা রাত কাটাবার পর ভোরে মিলবে বাস।

গাড়ি থামতে না থামতেই বিপুলবাবু ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। 'অমরেশ বাবু, নামুন নামুন। কুলি ডাকুন. শিগগির কুলি ডাকুন।'

অমরেশ হেসে বলল, 'ডাকুন না। আমাকে ডাকবার আগে কুলি তো আপনিও ডাকতে পারেন। ভদ্রলোকের স্ত্রী বললেন, 'তুমি অনর্থক ব্যস্ত হয়োনা। অমরেশবাবু যখন রয়েছেন সবই নাববে কিছুই পড়ে থাকবেনা। তুমি আগে নিজে নামো দেখি।' অমরেশ ঠাট্টা করে বলল, 'কি যে বলেন বউদি। উনি আপনাকে ফেলে নামেন কি করে। শেষে গাড়ি যদি আপনাকে নিয়ে চলে যায় কী উপায় হবে, ওঁকে ট্রেণের পিছনে পিছনে ছুটতে হবে যে।'

ভদ্রলোকের স্ত্রী বললেন, 'উনি তাও পারেন।'

কুলি ডেকে মালপত্র নামানো হল। স্যুটকেস বেডিং টিফিন-ক্যারিয়ার, ফ্লাস্ক, জলের ঘটি ওঁদের লটবহর নিতান্ত কম নয়। একটি সংসার নিয়ে চলেছেন ভদ্রমহিলা। যেখানে স্বামী স্ত্রী সেইখানেই তো সংসার। পরিবারের ক্ষুদ্রতম ইউনিট।

প্লাটফর্মে নেমে ভদ্রমহিলা সব মিলিয়ে নিলেন। গুণে নিলেন এক একটি করে। বললেন, 'ঠিক আছে অমরেশবাবু। আপনার বেডিং স্যুটকেস ছুটো নেমেছে।'

অমরেশ বলল, 'আমার গুলো নিয়ে ভাববেন না বউদি। ওগুলোর দাম এমন কিছু নয়। আপনাদেব জিনিসগুলো ঠিক থাকলেই হল।'

ভারী জিনিসগুলি কুলির মাথায় আর ছোট-ছোট হালকা জিনিস নিজেরা টানাটানি করে ওয়েটিংরুমে নিয়ে রাখল অমরেশ। তারপর সঙ্গীদের বলল, 'আপনারা এখানে বিশ্রাম করুন। আমি এক প্যাকেট সিগারেট নিয়ে আসি।'

সিগারেট কিনে প্লাটফর্মের ওপর দিয়ে পায়চারি শুরু করল অমরেশ। ট্রেণটা একটু আগে ছেড়ে গেছে। খুব বেশি লোক এই ষ্টেশনে নামেনি। নামলেও এদিক ওদিক সরে গেছে। প্লাটফরম

জনবিরল। সিগারেট টানতে টানতে পূবে পশ্চিমে দীর্ঘ প্লাটফরমের ওপর দিয়ে হাঁটতে লাগল অমরেশ।

ডিসেম্বরের শেষ। তবু শীত খুব বেশি নয়। আবহাওয়াটা ভালোই লাগছে। তৃতীয় শ্রেণীতে ভ্রমণের পথ-শ্রম মিটে আসছে একটু একটু করে। এই রাতটা ঘুমিয়ে নিতে পারলে সব কষ্ট যাবে। আগের রাতটা গাড়িতে ঘুম হয়নি। খবর নিয়ে এসেছে জলগাঁয়ে ঘুমোবার ভালো ব্যবস্থা আছে। টাকা পাঁচেক ব্যয় করলেই দোতলার ওপর রাজশয্যা মিলবে। বিপুলবাবু হয়তো অত খরচ করতে চাইবেন না। ভদ্রলোক একটু কৃপণ। কিন্তু ওঁরা যে ব্যবস্থাই করুন অমরেশ আজকের রাতটা ভালো করেই ঘুমিয়ে নেবে। পাঁচ টাকা কেন, দশ টাকা দিতে হলেও আজকের রাত্রের ঘুমটুকু সে না কিনে পারবে না।

আস্তে আস্তে সন্ধ্যা নেমে এলো। অপরিচিত ষ্টেশনে বেশির ভাগ সন্ধ্যাই কেমন যেন বিষণ্ণ লাগে। সন্ধ্যায় কোন ষ্টেশন ছেড়ে যেতেও যেমন বিষণ্ণতা বোধ করে অমরেশ, তেমনি কোন ষ্টেশনে এসে সন্ধ্যা-বেলায় পৌঁছেও সেই অকারণ উদাস ভাবের হাত এড়াতে পারে না। সবায়েরই কি এমন হয়? না কি এ বিষাদ শুধু তারই জীবনস্বাদের সঙ্গে মিশে আছে।

প্লাটফর্মের একেবারে পশ্চিম প্রান্তে এসে আর একটি যাত্রিণীর সঙ্গে একেবারে মুখোমুখি দেখা হয়ে গেল অমরেশের। এই অতিচেনা মেয়েটিকে সন্ধ্যার ফিকে আঁধার কেন রাত্রির গাঢ় অন্ধকারেও তার চেনা কঠিন নয়।

মন্দিরাও চিনেছে। আর চিনে অন্যান্য জায়গায় অন্যান্যবারের মত মুখ ফিরিয়ে পাশ কাটিয়ে যায় নি। অমরেশের মত সেও দাঁড়িয়ে পড়েছে। মন্দিরার চেহারার যে বিশেষ কোন পরিবর্তন হয়েছে তা নয়। এই তেত্রিশ চৌত্রিশেও সে তন্বীই রয়েছে। চেহারার গড়নই এমন যে কোনদিনই ওর স্থূলাঙ্গী হওয়ার আশঙ্কা নেই। আর সাত আট বছর মাষ্টারি করবার পরেও মুখের ভাবকে ওর ছাত্রীদের মত কী

করে অমন কচি আর কোমল করে রেখেছে ওই জানে। কিন্তু মন্দিরার সমবয়সী হয়েও অমরেশের মুখে অমন কোমলতা নেই। কড়া দাড়ি রোজ কামায়। তা না কামালেও কি তার মুখ খুব বেশি কচি থাকত, তার মনের অতি প্রবীণতা, সংসার সংগ্রামের ক্লিষ্টতা কি দাড়ি গোঁফে ঢাকা পড়ত ?

মন্দিরাই প্রথমে কথা বলল, 'অমন করে পথ আটকে দাঁড়ালে কেন ?'

অমরেশ বলল, 'আমরা তো কেউ কারো পথ আটকাইনি মন্দিরা। তুমিও না, আমিও না।'

মন্দিরা একটু হেসে বলল, 'তুমি বুঝি এখনো সেই কাব্যের ঢং-এ কথা বলা ছাড়নি। আমি ভেবেছিলাম অভ্যাসটা বুঝি বদলেছে।'

চেহারায় যত মৃদুতা আর নমনীয়তাই থাকুক, অমরেশের মনে হল কথাবার্তা ওর আরো শাণিত হয়েছে। ব্যবহারে দেখা দিয়েছে নিষ্করুণ কাঠিন্য।

অমরেশ বলল, 'একেবারে যে বদলাইনি তা নয়। তবে কিছু কিছু পুরোন অভ্যাস এখনো আছে। কিন্তু কাব্যও নেই রাজনীতিও নেই।'

মন্দিরা বলল, 'নেই, তবু তো সম্মেলন টম্মেলনগুলিতে বেশ যাচ্ছ দেখছি।'

অমরেশ বলল, 'তুমিও তো এসেছিলে।'

মন্দিরা বলল, 'সাহিত্য প্রীতির জন্য নয়। বেড়াবার জন্যে।'

অমরেশ হেসে বলল, 'আর যত অমিলই থাকুক, এই উদ্দেশ্যে আমরা অভিন্ন।'

এই অন্তরঙ্গ সুরকে আমল না দিয়ে মন্দিরা বলল 'তোমার স্ত্রীকে আননি কেন ?'

অমরেশ বলল, 'পথে নারী বিবর্জিতা বলে নয় স্ত্রী সদ্য হাসপাতাল থেকে মেয়ে কোলে করে বেরিয়েছে। স্ত্রীকে আনতে গেলে সেই নবজাতাকেও আনতে হয়।'

মন্দিরা বলল, 'শুনে সুখী হলাম, তোমার আর একটি হয়েছে। এই নিয়ে কটি হল ?'

অমরেশ বলল, 'তিনটি।'

মন্দিরা বলল, 'ছুটি ছেলে একটি মেয়ে ?'

'তুমি তো বেশ খবর রাখ দেখছি।'

মন্দিরা বলল, 'রাখিনা কানে আসে।'

সে এবার এগোবার জন্যে পা বাড়াল। আর হঠাৎ অমরেশের মনে হল, এই গতযৌবনা স্বামী-সন্তানের স্বাদ না পাওয়া মেয়েটির কাছে নিজের স্ত্রী-পুত্রের গল্প অত ঘটা করে বলে সে ভালো করেনি। পরম নিষ্ঠুরতার কাজ করেছে।

অমরেশ ফের কি বলতে যাচ্ছিল পিছন থেকে ডাক শুনতে পেল, 'ও অমরেশ বাবু, অমরেশ বাবু, আরে আপনি এখানে! আমরা যে ওদিকে আপনার চা আর খাবার নিয়ে বসে আছি।'

বসে আছেন ভদ্রলোক, ছুটে এসেছেন ভদ্রমহিলা। সঙ্গের পুরুষটি সিংহ-ও নন, উদ্যোগীও নন, কিন্তু মহিলাটি সব পুষিয়ে নিয়েছেন।

অমরেশ একটু বিরক্ত হয়ে বলল, 'আপনারা খেয়ে নিন, আমি এখন খাব না।'

মণিমালা (ভদ্রমহিলার নাম অমরেশ আমেদাবাদেই জেনে নিয়েছে।) বললেন, 'তাই হয় নাকি ? এক যাত্রায় পৃথক ফল কি হয় ? আপনাকে ফেলে আমরা খেতে পারি ? আরে আপনি যে এখানে ?'

এতক্ষণে মন্দিরাকে দেখতে পেয়েছেন মণিমালা, কিংবা দেখতে একটু আগে পেলেও কথা বলার সুযোগ তাঁর এখনই হল, 'আপনি যে এখানে ?'

মন্দিরা বলল, 'আমরা ইলোরা অজন্তা হয়ে এই পথে ফিরছি। আজ রাত্রের গাড়িতে কলকাতা যাব।'

মণিমালা বললেন, 'বাঃ বেশ মজাতো। আপনারাই তো জিতে গেলেন। চলুন চলুন সব গল্প শুনব। আসুন চা খেতে খেতে সব

শুনি। আমরা যদি একদিন আগে বেরোতে পারতাম আমাদেরও সব দেখা হয়ে যেত। তা নয়, বসে বসে মিছামিছি সব বক্তৃতা শুনলাম। আমার সঙ্গের ভদ্রলোক বক্তৃতা পেলে আর কিছু চাননা।'

মন্দিরা আপত্তি করল, অমরেশও। কিন্তু মণিমালা কিছুতেই শুনলেন না। দুজনকেই টেনে নিয়ে চললেন। লম্বা চওড়া বিরাট চেহারা। বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি। কিন্তু উৎসাহ-উদ্দীপনায় পঞ্চদশী। স্বামী শুধু নামেই বিপুল, ইনিই আসলে বিপুলা।

চা আর খাবার আগেই আনানো হয়েছিল। মন্দিরাকেও তাঁর ভাগ দিলেন। একটু হেসে বললেন, 'আপনাদের মধ্যে যখন আলাপ আছে, আপনার অর্ধেকটাই ওঁকে দিয়ে দিলাম, কি বলুন অমরেশবাবু ?'

অমরেশ বলল, 'আপনার যা খুশি।'

মণিমালা বললেন, 'আপনাদের মধ্যে যে আলাপ আছে তা কিন্তু আমি তখনই টের পেয়েছিলাম। কিন্তু আপনারা ওভাবে এড়িয়ে এড়িয়ে যেতেন কেন ?'

অমরেশ বলল, 'আপনার চোখ এড়াবার জন্যে।'

মণিমালা বললেন, 'কিন্তু ধরা তো পড়ে গেলেন। এড়াতে পারলেন তো না।'

অমরেশ একথার জবাব না দিয়ে বলল, 'আপনারা বসুন। আমি রাত্রের থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা করে আসি।'

বিপুলবাবু বললেন, 'হ্যাঁ তাই যান। শেষে হয়তো এই ওয়েটিং রুমেই রাত কাটাতে হবে। চলুন, আমিও আপনার সঙ্গে যাই।'

এই মুহূর্তে প্রৌঢ় এক প্রফেসর ভদ্রলোকের সঙ্গী হবার ইচ্ছা ছিল না অমরেশের। সে একটু একা থাকতে চাইছিল। তাই এড়িয়ে গিয়ে বলল 'না না, আপনি থাকুন, আমিই সব ব্যবস্থা করে আসছি।'

কিন্তু মণিমালা ফের ধমক দিলেন; 'আপনি আবার কি ব্যবস্থা করবেন শুনি। আমি সব খোঁজখবর জেনে নিয়েছি। রেলের হোটেলে

অত খরচা দিয়ে আমাদের থেকে দরকার নেই। মাত্র একটা রাতের তো মামলা। 'শুনুন, এখানকার ডাইনিং রুমে খেয়ে, একেবারে ওভারব্রীজ পেরিয়ে ওদিকে যে একটা হোটেল আছে আমরা সেখানে চলে যাব। এখানে একটা সীটের ভাড়াই পাঁচ টাকা, আর ওখানে একটা গোটা রুমই নাকি পাঁচ টাকায় পাওয়া যাবে। কত সুবিধে। তা ছাড়া কেউ কেউ বললেন. ওখান থেকে অজন্তার বাস ধরাও সুবিধে হবে। বাস ওই হোটেলের সামনেই দাঁড়ায়। পা বাড়ালেই আমরা একেবারে বাসের মধ্যে গিয়ে উঠে বসতে পারব। মালপত্রও আর বেশি টানাটানি করতে হবে না। তাই করুন অমরেশ বাবু।'

অমরেশ একটু বিরক্ত হয়ে বলল, 'বেশ তো আপনাদের যা ভালো মনে হয় তাই করুন। আমি একটু অন্য ব্যবস্থা করতে চাই, আজ নিরিবিলিতে আমাকে খানিকটা ঘুমিয়ে নিতে হবে।'

অমরেশ বেরিয়ে যাচ্ছিল মন্দিরা বলল, 'আমার ছোট ভাই অরুণ গেছে ওদিকে। যদি দেখতে পাও পাঠিয়ে দিয়ো।'

মণিমালা একটু মুখ টিপে হেসে বলল, 'ভাইকে খুঁজতে আপনি এবার নিজেও বেরিয়ে পড়তে পারেন। আমি আপনাকে আটকে রাখব না ভাই।'

কিন্তু মন্দিবা সেখানেই বসে রইল। বেরোল না।

অমরেশ সিগারেট ধরিয়ে ফের প্লাটফর্মে পায়চারি শুরু করল। আর একটা ট্রেণ ইন করেছে। যাত্রীরা উঠল নামল। কিন্তু ষ্টেশনের গোলমাল অমরেশের আত্মমগ্নতাকে কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ করতে পারল না।

আমেদাবাদ বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনে মন্দিরার সঙ্গে তার কয়েকবারই দেখা হয়েছে। ক্যাম্পে চিত্র প্রদর্শনীতে সম্মেলনের মণ্ডপেও মন্দিরার সঙ্গে তার চোখাচোখি হয়ে গেছে। কিন্তু মন্দিরা বারবার এড়িয়ে গেছে তাকে। এই দেখা হওয়া যেন তার কাছে মোটেই বাঞ্ছনীয় নয়। এই আকস্মিকতা নিতান্তই দৈবদুর্বিপাক মাত্র। অমরেশ বুঝতে পেরেছে অমরেশের সঙ্গে যে তার পূর্ব পরিচয় ছিল একথা মন্দিরা আর

স্বীকার করতে চায় না। এক জায়গায় বসে কি দাঁড়িয়ে খানিকক্ষণ আলাপ আলোচনা করা তো দূরের কথা, সামান্য কুশল প্রশ্নেও যেন তার অনিচ্ছা। তবু অমরেশ জিজ্ঞাসা না করে পারেনি, 'কেমন আছ ?'

মন্দিরা বলেছে, 'ভাল আছি।'

তারপর দ্বিতীয় প্রশ্নের সুযোগ না দিয়ে মন্দিরা মেয়েদের দলের মধ্যে মিশে গেছে।

গত কয়েক বছর ধরে কলকাতায়ও ঠিক এই রকম ব্যবহারই করে আসছে মন্দিরা। অমরেশ থাকে টালিগঞ্জে মন্দিরা পটলডাঙায়। দুজনেই রাজনীতি ছেড়ে দিয়েছে। গণসংযোগ নেই, মনঃসংযোগ করতে হয়েছে একান্তভাবেই পরিবার প্রতিপালনে। তাই দেখা সাক্ষাৎ বড় একটা হবার কথা নয়। তবু বাসে ট্রামে সভাসমিতিতে কি ছবির একজিবিশনে যদি ক্বচিৎ কখনো দেখা হয়ে যায় মন্দিরা অপরিচিতার মতই ব্যবহার করে। অত্যন্ত নিস্পৃহ উদাসীনতার ভঙ্গি। পূর্ব পরিচিত হয়ে মন্দিরার মত মেয়েও যে চোখে মুখে এমন বোবা হয়ে থাকতে পারে অমরেশের তা ধারণা ছিলনা। কেউ কেউ বলে মন্দিরার মাথায় আজকাল ছিট হয়েছে। ওর চালচলন দেখে মাঝে মাঝে তাই যেন বিশ্বাস করতে ইচ্ছা করে অমরেশের। যদিও তা ভাবতেও কষ্ট কম হয়না। মন্দিরার মত মেয়ে সেই সামান্য একটা ব্যাপারকে এমন গুরুতর বলে ভাববে, সারা জীবন সেই একটি ঘটনাকে পুষে রাখবে, দুষ্ট ক্ষতের মত তাকে বয়ে নিয়ে বেড়াবে তা অমরেশ আজও ভাবতে পারে না। সে তো জানে মন্দিরার চেয়ে যারা অনেক কম লেখাপড়া জানে, যে সব মেয়ে মন্দিরার তুলনায় শুধু কম ইনটেলেকচুয়াল নয়, প্রায় নির্বোধ, ভাবাবেগের ফানুস, তারাও এ ধরণের ব্যাপারকে কত সহজভাবে নিয়েছে, কত অনায়াসে ভুলে গেছে বিয়ে করে সুখে স্বচ্ছন্দে ঘর সংসার করছে, কেউ কেউ সেই সঙ্গে দলীয় খাতায়ও নাম রেখেছে, শুধু মন্দিরাই তা পারলেনা। দলের মধ্যে সব চেয়ে যে ছিল উজ্জ্বল রত্ন, সেই একেবারে কাঁচ বনে গেল।

এখন একা অমরেশকে দোষ দিলে কি হবে, সর্তে সম্মতি তো দুজনেরই ছিল। পোষ্টগ্রাজুয়েট ক্লাসে তাদের বন্ধুত্ব আর দলের সহকর্মিতাকেই তারা বিয়ের পক্ষে চূড়ান্ত মনে করবে না, কলকাতার বাইরে গিয়ে তারা একমাস একসঙ্গে কাটাবে। মিলিয়ে দেখবে একজনের প্রতিদিনের অভ্যাস, প্রতিদিনের চালচলন, ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র আচরণ ভাষা মনন আর একজনের সঙ্গে মেলে কিনা। যদি মিলে যায়, সে মিলকে তারা বিয়ের বাঁধনে বাঁধবে, যদি না মেলে তাহলে তারা আর ম্যারেজ রেজিষ্ট্রারের কাছে যাবে না, কিন্তু বন্ধুত্বের বন্ধন অক্ষুণ্ণ রাখবে। এই সর্তে দুজনেই তখন দুঃসাহসের রোমাঞ্চ বোধ করেছিল। যেন তারা কলকাতা থেকে গিরিডি নয়, পৃথিবী থেকে আর এক গ্রহলোকে যাত্রা করেছে।

মন্দিরার বাবা সাবজজ। অমরেশের বাবা সাধারণ এম. বি. ডাক্তার। অবস্থার দিক থেকে দুজনেই মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলে মেয়ে, শিক্ষা দীক্ষাতেও তাই। কিন্তু তাদের ধারণা-ভাবনা মধ্যবিত্ত সংস্কারের মধ্যে আবদ্ধ নয়। বরং সব রকম সংস্কার তারা ভাঙতে উৎসুক, রীতিনীতির যে কোন সীমা ডিঙিয়ে যেতে তারা উৎসাহী। কে কাকে হারাবে বন্ধু আর বান্ধবীদের মধ্যে সেই প্রতিযোগিতার শেষ নাই।

চুক্তি করে সর্ত করে তারা দুজনেই পালিয়েছিল। পালানো কথাটা বাবা মা-রা ব্যবহার করেছিলেন, আর কোন কোন ঈর্ষান্বিত বন্ধু। তারা নিজেরা ও শব্দ ব্যবহার করেনি। শুধু কৌশলের খাতিরে না জানিয়ে যেতে হয়েছিল। পালিয়ে থাকেনি, গিয়ে গিরিডিরি সেই হোটেলের ঠিকানাও দিয়েছিল তারা।

দুপক্ষের বাবা মা-ই সেই চিঠির জবাবে জানালেন, 'তোমাদের বিয়েতে আমাদের আপত্তি নেই। এখান থেকে বিয়েটা সেরে যদি যেতে তাহলে আর এত নিন্দা হত না। এবার এসে সামাজিক ভাবে বিয়েটা সেরে নাও তাহলে সব ঝামেলা মিটে যাবে।'

কিন্তু অত সহজে ঝামেলা মিটাবার জন্যে তো তারা যায় নি।

তারা সেই সহরের হোটেলে একমাস ছিল। বিয়ে না করে একসঙ্গে বাস করার যে দুঃসাহস প্রতি মুহূর্তে তা তারা অনুভব করত। পাহাড়ে পাহাড়ে ঘুরে বেড়ানো, ফটো তোলা, ঝরণায় স্নান, যখন তখন বেরোন, যখন তখন ঘোরা, পরদিন যাতে কোন ক্রমেই পূর্ব দিনের পুনরাবৃত্তি না হয় সে জন্যে আগে থেকেই প্ল্যান ঠিক করা সব ব্যাপারেই তারা অভিনবত্ব আর মৌলিকতার পরিচয় দিয়েছিল। জীবনে দুরন্তপণা বলতে কি বোঝায় তা তারা সেই কদিনে ভালো-ভাবেই জেনেছে। ভোগ আর সম্ভোগের কোন উপায়ই তারা বাদ রাখেনি। তাছাড়া একজন যখন আর একজনকে নিজের সব খানি ধরে দেয় তখন অন্য কোন প্রকরণ উপকরণের প্রয়োজনই হয় না। অন্তত সেই বয়সে হয় না।

তারা ভেবেছিল তাদের পারস্পরিক পরীক্ষা সার্থক হয়েছে। এবার তারা ফিরে গিয়ে সামাজিক অনুষ্ঠানটুকু সেরে ফেলতে পারবে। অমরেশ ইনকাম .ট্যাকস অফিসে সিনিয়র গ্রেড ক্লার্কের চাকরি পেয়েছে। মন্দিরা এখনো কাজ কর্ম কিছু করেনা। দলের অফিসেই তার সব সময় যায়। কিন্তু দরকার হলে সেও চাকরি করতে পারবে। দুজনের রোজগার একসঙ্গে মিললে তাদের কোন অসুবিধা হবেনা।

সবই ঠিক ছিল কলকাতায় ফিরে যাওয়ার সপ্তাহখানেক আগে গোলমাল বেঁধে গেল। মন্দিরা বলল, হোটেলওয়ালার এক ভাগ্নে তাকে দেখে হেসেছে এবং আড়ালে বলাবলি করেছে মন্দিরা নাকি অমরেশের মিসট্রেস।

এ কথা শুনে অমরেশ হেসে বলল, 'মিসট্রেসের আর একটা মানে আছে কর্ত্রী, তুমি সেই মানেটাকেই ধরে নাও।'

মন্দিরা বলল, 'ওরা যে কী অর্থে কথাটা বলেছে তা তুমি নিশ্চয়ই জানো।'

অমরেশ বলল, 'সে তো কত লোকে কত কি বলে। সব কথাই

যদি গুরুর মন্ত্রের মত কানে নাও তাহলে শুধু ছুটো কানই পচবে তা নয়, মনটাও নষ্ট হয়ে যাবে।'

মন্দিরা বলল, 'গুরুগিরি তুমিও নিতান্ত কম করতে চাও না; কথায় কথায় সারমন দাও। কিন্তু আসল কাজের বেলায় ভয় পাও এগোতে। তুমি যদি পুরুষ হও তাহলে হোটেলওয়ালার ভাগ্নেকে তোমার ছু কথা শুনিয়ে দিয়ে আসা উচিত।'

অমরেশ বলল, 'কে একটা লোক কি বলল না বলল, আমি সে কথা শুনতেও পেলাম না আর তুমি বলছ আমি গায়ে পড়ে তার সঙ্গে ঝগড়া করতে যাব?'

মন্দিরা বলল, 'তোমার নিজের নামে কেউ কিছু বললে তাকে কিন্তু আস্ত রাখতে না।'

অমরেশ হেসে বলল, 'মোটেই না। আমাকে হাজার বার কেউ যদি তোমার উপপতি বলত আমি কিছু মনে করতাম না তোমারও কিছু মনে রাখা উচিত নয়। যে যাই বলুক, তুমি নিজে তো জানো তুমি কী। আর সে কথা যদি বল, সংসারে জোড়ায় জোড়ায় স্বামী স্ত্রীর সম্পর্ক দেখে আমার মনে হয়েছে যাকে উপ বলি আসলে তাই হল পুরো। আর যে সব বৈধ সম্পর্ক পুরো বলে সমাজে চলে হাচ্ছে তাই হল আধা। শুধু আধা নয় সিকি ছু'আনির ছোট ফ্রাকসন।'

মন্দিরা ধমক দিয়ে বলল, 'রাখো রাখো। সব সময় তোমার ওই ভাঁড়ামি আর ভালো লাগে না। সব কিছুরই একটা সীমা আছে। আমার কথা তুমি শুনবে কিনা তাই বল।'

অমরেশ বলল, 'দেখ, প্রেমের জন্যে আমি সব ছাড়তে রাজি, কিন্তু আমার যুক্তি বুদ্ধিটুকু দয়া করে তোমার পায়ে অঞ্জলি দিতে বলোনা। তা পারব না।'

মন্দিরা হঠাৎ চটে গিয়ে বলল, 'জানি জানি, তোমার মত স্বার্থপর আত্মসর্বস্ব মানুষ আমি আর ছুটি দেখিনি। তোমার

মত মানুষের বিয়ে না করাই ভালো, তুমি নিজেই তোমার পক্ষে যথেষ্ট।'

অমরেশ বিরক্ত হয়ে বলল, 'চুপ করো অত চেঁচিয়োনা। লোক-জন জড় হয়ে যাবে যে। যখন তুমি চেঁচিয়ে কথা বল, তোমার গলা যে কোন ভদ্রমেয়ের গলা তো ছাড়ায়ই, ভদ্রলোকের গলাকেও ছাড়িয়ে যায়। আসলে যাই বল, তুমি একটু পুরুষালি মেয়ে, চলায় বলায় সব ব্যাপারে—।'

মন্দিরা জবাব দিল, 'আমি পুরুষালি মেয়ে কিনা জানিনে, কিন্তু তুমি পুরুষও নও, মেয়েও নয়, তুমি—তুমি একটি আজব জীব।'

মন্দিরার পীড়াপীড়িতে অমরেশ এক সপ্তাহের জন্যে হোটেল বদলাতে বাধ্য হয়েছিল। কিন্তু নতুন হোটেলে গিয়েও শান্তি আসেনি। পুরো পাঁচদিন তারা শুধু ঝগড়া করে কাটিয়েছে। তারপর ফিরে এসেছে কলকাতায়।

অমরেশের মা তাকে একা ফিরতে দেখে জিজ্ঞাসা করলেন, 'বউমাকে কোথায় রেখে এলি ?'

অমরেশ বলল, 'সে এখনো তোমার বউমা হয়নি মা, কোনদিনই হবেনা।'

মা আঁতকে উঠে বললেন, 'সে কিরে। একটা মেয়ের অমন সর্বনাশ করে এলি। এখন বলছিস বিয়ে করবিনে!'

অমরেশ বলল, 'তুমি যাকে সর্বনাশ বল মা, আমরা তাকে সর্বনাশ বলিনে। ওতে জীবনের কিছুই নাশও হয়না, হ্রাসও হয়না। বরং বিয়ে করলেই সর্বনাশ হত।'

তারপর আরো কিছুদিন অমরেশ অপেক্ষা করল। কিন্তু মন্দিরা না চাইল ক্ষমা, না দেখাল সন্ধির আগ্রহ। পরিবারের লাঞ্ছনা গঞ্জনা বন্ধুবান্ধবদের শ্লেষবিদ্রূপ সহ্য করে শক্ত হয়ে রইল। কাঠের মত শক্ত, পাথরের মত শক্ত। ওর ষ্ট্যামিনা আছে মনে মনে স্বীকার করল অমরেশ। কিন্তু যা সাধারণের চোখে, পার্টির আর পাঁচজন

সদস্যের চোখে ওর গুণ, দয়িত হিসাবে অমরেশের চোখে তা ওর দোষ বলে ধরা পড়ল। সে খুঁটে খুঁটে বিচার করে দেখল সত্যিই ওর মধ্যে পুরুষালি ভাবটা বেশি। ওর গলা চড়া, হাসি উঁচু, অসহিষ্ণুতা সীমাহীন, বুদ্ধির চেয়ে জিভ বেশি ক্ষুরধার, অমরেশ ওকে পছন্দের চেয়ে অপছন্দই বেশি করে। তার মনে হত যে মেয়ের নাকের নীচে পুরুষের মত গোঁফ গজায় তাকে যেমন কুশ্রী দেখায় তেমনি যে মেয়ের স্বভাবে নমনীয়তা নেই তারও শ্রী হানি হয়।

কিন্তু এ শুধু শ্রী আর কুশ্রীতার কথাই নয়, শান্তি অশান্তির কথা। অমরেশের পৌরুষের ওপর মন্দিরার যদি আস্থা না থাকে, ঔদার্যের প্রতি শ্রদ্ধা না থাকে, তার সমস্ত সুকুমার বৃত্তিকে মন্দিরা যদি অমরেশের স্বভাবের ক্ষীণতা দুর্বলতা বলেই মনে করে তাহলে তো বিয়ে করে কেউ সুখী হতে পারবেনা। বিয়ে তো একজনের জন্যে নয়, দুজনেব সুখের। এতে একজন সুখী না হলে দুজনই অসুখী হয়।

তবু অমরেশ মিটমাটের একটা আশা করেছিল। ভেবেছিল ফোনে হোক, চিঠিতে হোক মন্দিরা তাকে একটা খবর দেবে। একটি শব্দে শুধু একটি কথা জানাবে, 'এসো।' কিন্তু মন্দিরা তার উলটো কাণ্ড করতে লাগল। বন্ধুদের মধ্যে বলে বেড়াল সমস্ত দোষ অমরেশের। সে নিজে এসে ক্ষমা না চাইলে মন্দিরা নাকি আর কোন সম্পর্ক রাখবেনা। এ কি ভুলত্রুটিব জন্যে দলনেতা কি দল-নেত্রীর কাছে ক্ষমা চাওয়ার ব্যাপার! অমরেশের মনে হল রাজনীতি মন্দিরাকে আর কোন শিক্ষাই দেয়নি, শুধু মর্যাদাবোধের নামে দম্ভকে জাগিয়ে দিয়েছে, ব্যক্তিত্বের নামে স্ব-তন্ত্রকে সার বলে শিখিয়েছে। নারী কি অমরেশের কাছে এতই অপরিহার্য যে নতজানু হয়ে তার করুণা ভিক্ষা করতে হবে?

মিল আর হলনা, সামান্য মীমাংসাও নয়। যতদিন গেল তত যেন বিরোধ আরও বাড়তে লাগল। মন্দিরা দল বদলাল মত বদলাল, শেষে রাজনীতিই ছেড়ে দিল। সবাই অবাক হয়ে গেল তার কাণ্ড দেখে।

বছর তিনেক বাদে মায়ের পীড়াপীড়িতে অতিষ্ঠ হয়ে অমরেশ বিয়ে করল। মেয়েটির বিদ্যা স্কুলের গণ্ডী পার হয়নি। কিন্তু লাবণ্য অপরিসীম। স্বভাব সুমিষ্ট, কোমল নমনীয়। প্রকৃতির সঙ্গে মিলিয়েই বোধ হয় তার বাবা নাম রেখেছেন সুবিনীতা। অত বিনয় অবশ্য অমরেশের পছন্দ নয়। সে নামটাকে ছোট আর সংক্ষিপ্ত করে ডাকল, 'নীতা।'

তারপর সবাই যেমন ভোলে, জীবনের এই অধ্যায়টা অমরেশও ভুলে গিয়েছিল। এক শহরে বাস করেও তার সঙ্গে অমরেশের দেখা সাক্ষাৎ যোগাযোগ নেই, মনে পড়বে কোন নিদর্শনে?

ওয়েটিংরুমের সামনে আসতে মণিমালা বেরিয়ে এসে আবার পাকড়াও করলেন, 'ও অমরেশবাবু, অমরেশবাবু।'

অমরেশ মনে মনে ভাবল, 'আচ্ছা জবরদস্ত মহিলা একটি।' এগিয়ে এসে বিরক্তি গোপন করে বলল, 'কি বলছেন বউদি।'

মণিমালা বললেন, 'আপনি কি সীট ভাড়া করে ফেলেছেন?'

'না।'

'তা হলে দয়া করে এখন আর করবেন না। আমি সব ব্যবস্থা করে ফেলেছি। আমরা ওদিককার হোটেলেই গিয়ে থাকব। শুধু সস্তার জন্যে নয়। সুবিধের জন্যে। ভেবে দেখলাম তাই সবচেয়ে ভালো হবে। অরুণকে পাঠিয়েছি। ওরাও দুই ভাইবোনে আমাদের সঙ্গে থাকবে। এত রাত্রে ওদের আর গাড়ি ধরে দরকার নেই। ভোরে গেলেই হবে। মন্দিরাকেও বলে কয়ে রাজী করিয়েছি। কি একগুঁয়ে মেয়ে বাবা।'

অমরেশ আপত্তি করেও রেহাই পেলনা। মণিমালা ছাড়বার মেয়ে নন। তিনি যেন একেবারে নেতৃত্বের অধিকার নিয়ে জন্মেছেন। শুধু স্বামী নয়, সব পুরুষই তাঁর শাসনাধীন। তিনি জোর করেই অমরেশের বাক্স বিছানা সেই হোটেলে পাঠিয়ে দিলেন।

দলের সঙ্গে না মিশে একাই খেয়ে নিল অমরেশ। বসে বসে ঘুরে ঘুরে আরো প্যাকেট দুই সিগারেট ধ্বংস করল।

কোন ট্রেণেব আর টু শব্দটি পর্যন্ত নেই। ছোট ষ্টেশনটি আবার নির্জন আর স্তব্ধ হয়ে রয়েছে। আকাশে অসংখ্য তারা ছড়ানো, মনের টুকুরো টুকুরো চিন্তার মত। অপরিচিত ষ্টেশনের প্লাটফর্মে এই সব রাত্রিকে রহস্যময়ী বলে মনে হয় অমরেশের। সন্ধ্যার সেই বিষণ্ণতা আর থাকেনা। তার বদলে আশা-আশঙ্কা আতঙ্ক-রোমাঞ্চের সংমিশ্রণে এক আরব্য রজনী যেন ধীরে ধীরে তার সমস্ত সত্তাকে আবৃত করতে থাকে।

আচ্ছা এ ব্যবস্থায় মন্দিরার মত মেয়ে কেন রাজী হল। সে তো অনায়াসে মণিমালাব হাত এড়িয়ে ব্রীজের ওপারে ভালো হোটেলে থাকত পারত। তবে কি…তবে কি। তবে কি মন্দিরা তার সঙ্গে আব একবার দেখা করতে চায়। আর কোন কথা বলতে চায়? বলতে চায় কি জন্যে সে বিয়ে করেনি? কিন্তু সেকথা শোনারই বা এত আগ্রহ কেন অমরেশেব? শুনে তার লাভ কি? শুনে সে কি করবে?

অমরেশের ফের মনে হল তার এসব জল্পনা-কল্পনা একেবারেই অর্থ-হীন, তার মত মণিমালার জবরদস্তিতে মন্দিরাও এক রাত্রির জন্যে এক হোটেলে থাকতে রাজী হয়েছে। তার এই সম্মতির এ ছাড়া কোন দ্বিতীয় ব্যাখ্যা নেই।

ব্রীজ পার হয়ে একটু বেশি রাত্রেই হোটেলে গেল অমরেশ। গিয়ে দেখল এক বিচিত্র ব্যবস্থা হয়েছে। শুধু এক হোটেলে নয়, একটি ঘরেই তাদের সকলের থাকবার বন্দোবস্ত করেছেন মণিমালা। এ ছাড়া উপায় নেই, আর কোন সীট নেই হোটেলে। ভিতরের দিকে ছোট একখানি মাত্র ঘব পাওয়া গেছে। তিনখানা খাটিয়া ছিল। দু'খানা সরিয়ে ফেলেছেন মণিমালা। শুধু একখানা রেখেছেন তাঁর আর মন্দিরার জন্যে। আর পুরুষদের জন্যে মেঝেয় ফরাস। ষোল সতের

বছরের ছেলে অরুণ এরই মধ্যে ঘুমিয়ে পড়েছে। পঞ্চাশোত্তর প্রৌঢ় বিপুলবাবু অনেক আগেই নাক ডাকাতে শুরু করেছেন।

তক্তপোষের ওপরে দেয়াল ঘেঁষে দেয়ালের সঙ্গে মিশে মুখ ফিরিয়ে মন্দিরাও কি ঘুমোচ্ছে না ঘুমের ভান করে পড়ে রয়েছে? আশ্চর্য এই ব্যবস্থায় সে রাজী হল কি করে? সে কি ভেবেছে শুধু দেয়ালের দিকে মুখ ফিরিয়ে থাকলেই এই লজ্জাকর বিসদৃশতা কারো চোখে পড়বে না?

মণিমালা তখনো জেগে আছেন। জরদা দিয়ে পান খাচ্ছেন। অমরেশকে দেখে বললেন, 'কি আপনার এতক্ষণে সময় হল?'

অমরেশ বলল, 'হ্যাঁ হল। কিন্তু আমি তো এভাবে থাকতে পারব না বউদি।'

মণিমালা হেসে বললেন, 'আরে পারবেন, খুব পারবেন। পথে ঘাটে অত বাছবিচার করতে নেই। এবার লক্ষ্মী ছেলেটির মত আপনার দাদার পাশে দরজা ঘেঁষে শুয়ে পড়ুন। দোরটা কিন্তু দয়া করে বন্ধ করে শোবেন। নইলে চোর এসে কিছুই আর রেখে যাবে না।'

ভদ্রমহিলা চাদর মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়লেন। একবার মুখ বাড়িয়ে বললেন, 'দয়া করে আলোটা নিবিয়ে দেবেন।'

না নিবিয়ে দিয়ে আর উপায় কি।

এতক্ষণ স্থূলাঙ্গী মণিমালার আড়ালে মন্দিরা যেন লুকিয়ে ছিল। এবার আঁধারের আড়ালে ঢাকা পড়ল। দরজা বন্ধ অন্ধকার ঘরে এখন কাউকে আর দেখা যায় না। মন্দিরা একেবারেই অদৃশ্য হয়েছে।

কিন্তু কিছুতেই ঘুম আসছেনা অমরেশের। স্বস্তি কি অস্বস্তি বোঝা যাচ্ছেনা, আশা কি আকাঙ্ক্ষা তাও বুঝবার যো নেই। গিরিডির হোটেলে খাট আলমারি ড্রেসিং টেবিলে চমৎকার সুন্দর সাজানো ঘরে একা মন্দিরাকে নিয়ে থাকতে তো তার কোন ভয় হয়নি, আজ এক ঘর লোকের মধ্যে তার সঙ্গে থাকতে এত ভয় কিসের?

মন্দিরা যদি উঠে আসে। উঠে এসে হোটেলের বাইরে গিয়ে তারা ভরা আকাশের নীচে আর দুটি অপলক তারা তার মুখের দিকে মেলে ধরে? অস্ফুট স্বরে জিজ্ঞাসা করে, 'সত্যি করে বল কেন তুমি আমাকে অপছন্দ করেছিলে? কেন তুমি যাওনি? আমার সমস্ত দম্ভ অভিমান অহংকার নিজে গিয়ে কেন চুরমার করে দাওনি? তুমি কি শুধু আমার বাইরের দম্ভ দেখেছ? ভিতরের হাহাকারটা শুনতে পাওনি। তাহলে আমাকে কেন নাওনি, কেন নাওনি, কেন নাওনি?'

যদি জিজ্ঞাসা করে মন্দিরা আজ তার কী জবাব দেবে অমরেশ? জিজ্ঞাসা সে মুখ ফুটে করুক আর না করুক, কোন কথা বলুক আর না বলুক এত কাণ্ডের পরেও একই হোটেলে একই ঘরে অমরেশের সঙ্গে রাত্রিবাসের সম্মতি জানিয়ে, সুযোগ নিয়ে তার সব কথা সে প্রকাশ করে দিয়েছে। সে বলে দিয়েছে এত দ্বেষ বিদ্বেষ শত্রুতা বিবোধিতার মধ্যেও রুদ্ধ হৃদয়ের এক নির্জন কন্দরে একটি জানালা এখনো খোলা আছে।

বিপুলবাবুর সত্যিই বড় বেশি নাক ডাকে। তাঁর জ্বালায় আজ আর ঘুমোবার জো নেই অমরেশের। অথচ যত দাম দিয়েই হোক আজ রাত্রের ঘুমটুকুকে সে কিনে নেবে পণ করেছিল। দাম সে দিয়েছে। কিন্তু তার বিনিময়ে ঘুম কি সে সত্যিই চায়? মন্দিরা আর কতক্ষণ ঘুমের ভান করে পড়ে থাকবে? না কি সে চায় যে মান ভাঙাতে পারেনি সে অন্তত ভান ভাঙাক! কিন্তু সাহস হল না অমরেশের। ঘর ভরতি লোক। ছি ছি ছি—কেউ যদি টের পায়, কেলেঙ্কারির আর শেষ থাকবে না।

কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছিল টের পায়নি অমরেশ। টের পেল ঘুম ভাঙবার পরে। তখনো বেশ রাত আছে। কত রাত ঘড়ি দেখে জানবার ইচ্ছা করল না। আলো জ্বালাতে ভয় পেল। যদি দেখে মন্দিরা তখনো জেগে আছে। তার চেয়ে উঠে গিয়ে বাইরে থেকে একটা সিগারেট খেয়ে আসা ভালো।

হোটেলের একটা ঘরে কারা তাস খেলছে। এখানকার লোকজন কি ঘুমোয় না? না কি মালিকও যোগ দিয়েছে ওদের দলে। সদর দরজা খোলা। রাত কি এত তাড়াতাড়িই ভোর হয়ে গেল? নাকি এখনো আছে খানিকটা?

বাইরে হোটেলের সামনে এসে সিগারেট ধরাল অমরেশ। সামনে অনেকখানি প্রশস্ত জায়গা। ডানদিকে কতকগুলি ঘোড়ারগাড়ি দাঁড়ানো। ঘোড়াগুলি কি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঘুমোয় আর ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে লেজ নাড়ে?

পশ্চিমদিকে কতকগুলি সারি সারি দোকান। একটি দোকানে রেকর্ডে লারে লাপ্পা সুরের কি একটা গান বাজছে। আজ কি সারা রাতই ওদের জেগে থাকার পালা? আজ কি কোন উৎসব, কোন পর্ব না কি ওদের?

সিগারেট শেষ করে অমরেশ ফিরে এসেছিল, হঠাৎ চোখে পড়ল মেয়েদের মাথার একটি রূপালি কাঁটা পড়ে আছে। কি খেয়াল হল অমরেশের। তুলে নিল কাঁটাটা। তার মনে হল অমরেশের মত সেও এসেছিল, সেও উঠে এসে দাঁড়িয়েছিল এখানে। হয়তো তারই মত অপেক্ষা করেছিল। এই কাঁটা তার অভিজ্ঞান। তার খোঁপায় ফুল ছিল। সেই ফুলও সে রেখে যেতে পারত। কিন্তু ফুল অন্য-লোকের পায়ের তলায় দলিত হলে তার কিছুই আর থাকে না। কাঁটাটা থেকে যায়।

ফিরে এসে ফের শুয়ে পড়ল অমরেশ। নিজের অদ্ভুত ব্যবহারের কথা ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়ে পড়ল। ঘুম ভাঙল মণিমালার ডাকে, 'ও অমরেশ বাবু, উঠুন, উঠুন। অজন্তার বাস এসে গেছে।'

অজন্তার বাসে না উঠেও, তখন পর্যন্ত অজন্তার চিত্রকলা না দেখেও স্বপ্নের মধ্যে অজন্তারই কোন ছবি দেখছিল অমরেশ। দূরদূরান্তর বাসিনী এক চিত্রকায়া-নারী তার রঙরেখার বাঁধন ছিঁড়ে বহু বাধা-বিঘ্ন, লজ্জা সংকোচ পার হয়ে গোপনচারিণী অভিসারিকার বেশে তার কাছে এসে পৌঁছেছিল। ঘুমের মধ্যে, স্বপ্নের মধ্যে স্পর্শ করেছিল তাকে। সেই ছোঁয়া কোনদিনই আর মুছে যাবে না।

মর্যাদা

হাসপাতালের আবহাওয়াটা ভারি অদ্ভুত লাগে সুপ্রীতির। অদ্ভুত লাগে কারণ একই সঙ্গে ভয় আর ভালবাসা, তৃষ্ণা আর অরুচিতে জড়ানো এক মিশ্রিত তীব্র অনুভূতির স্বাদ সে পায়। ডাক্তার নার্সদের উদাসীন নিস্পৃহ নিষ্কাম ভঙ্গির সঙ্গে রোগীদের আত্মীয় স্বজনের ব্যস্ততার ছুটোছুটি, রোগার্তের কাতরতা, তার যন্ত্রণার শব্দময় কখনো-বা নিঃশব্দ প্রকাশ সুপ্রীতির মনে এক বিচিত্র নতুন জগতের সংকেত নিয়ে আসে। হাসপাতালের গন্ধের মধ্যেও বেশ একটু রাসায়নিক অভিনবত্ব আছে। নানারকম নাম-না-জানা ওষুধের গন্ধের সঙ্গে রয়েছে প্রতিষেধক ব্যবস্থা। ব্লিচিং পাউডার ডেটল আর আয়োডিনের গন্ধ। দৈনন্দিন গৃহস্থালীর গন্ধ থেকে আলাদা এই মিশ্রিত গন্ধ সুপ্রীতির কাছে অনেকটা সৌরভের মত মনে হয়। খানিকটা বৈচিত্র্য আর নতুনত্বের স্বাদ নিয়ে আসে। মন উদাস হলে সুপ্রীতি শ্মশান কি গ্রেভইয়ার্ড দেখতে যায় না। কাছাকাছি কোন হাসপাতাল থাকলে বরং সেখানে যায়। শ্মশান তো শূন্য। সেখানে নিঃসীম স্তব্ধতা। সেখানে দেখবার কিছু নেই, শোনবার কিছু নেই। সেখানে সব জ্বালা, সব যন্ত্রণার অবসান। কিন্তু দেখতে হলে দেহ ধারণের দুঃখ, তার যন্ত্রণা প্রত্যক্ষ করতে হলে এসো এই হাসপাতালে। এখানে রোগের সঙ্গে মানুষের আমৃত্যু সংগ্রাম, সমবেত সংগ্রাম দেখতে পাবে। সেবা শুশ্রূষা, সহানুভূতি, ওষুধে অস্ত্রোপচারে নিরাময়ের কতরকম কত ব্যবস্থাই না রয়েছে। এই হাসপাতাল মানুষের গৌরবকেন্দ্র, বিজ্ঞানের জয়যাত্রার পথে একটি প্রধান শিবির, যেখানে নিত্য নতুন রোগ, মৃত্যুভয় আর নিত্য নতুন সংগ্রাম কৌশল।

মফঃস্বলে আর কলকাতার একাধিক হাসপাতালে কখনো রোগের চিকিৎসার কখনো-বা ছেলে হবার জন্যে সুপ্রীতিকে থাকতে হয়েছে। কত ডাক্তার নার্স, রোগী আর রোগীদের আত্মীয় স্বজনের সঙ্গে আলাপ করেছে। আবার রোগার্ত আত্মীয় বন্ধুদেরও দেখতে গেছে কতবার। কখনো রোগীকে সুস্থ করে মুখে হাসি নিয়ে ফিরেছে, আবার চোখের জলেও যে ফিরতে না হয়েছে তা নয়। তবু তার কৌতূহল ঔৎসুক্য আর অনুরাগ দেখে স্বামী সুধাংশু মাঝে মাঝে হেসে বলেছে, 'তোমার ডাক্তার কি নার্স হওয়াই ভালো ছিল। তাহলে হাসপাতালে আরো বেশি সময় থাকতে পারতে।'

সুপ্রীতির কথাটা তেমন মনঃপূত হয়নি। নার্স কি ডাক্তার হলে হাসপাতাল সম্বন্ধে এর চেয়ে বেশি অভিজ্ঞতা নিশ্চয়ই সুপ্রীতির হত। কিন্তু এত আগ্রহ, এত মমত্ব, আর এত অন্ধ প্রীতি থাকত কিনা সন্দেহ। ক্যানসার হাসপাতালের নির্জন ভিজিটবস্ রুমের দেয়াল ঘেঁষা একটি বেঞ্চে বসে স্বামীর কথা মনে করে মৃদু হাসল সুপ্রীতি, আর সঙ্গে সঙ্গে নিজেই চমকে উঠল। আশ্চর্য আজও সে হাসতে পারছে। আজও এই মুহূর্তে সে হাসপাতাল নিয়ে দিব্যি কাব্য আর দর্শন রচনা করতে পারছে। আর তারই ঠিক মাথাব ওপরে দোতালাব কেবিনে রোগের কণ্টক শয্যায় শুয়ে মৃত্যুর প্রতীক্ষা করছে বিমলেন্দু হালদার, সুধাংশু আর সুপ্রীতির এককালের ঘনিষ্ঠ বন্ধু বিমলেন্দু, সুপ্রীতির ঘনিষ্ঠতর

না শুধু মৃত্যুরই প্রতীক্ষা করছে না বিমলেন্দু। মৃত্যুর আগে সে আর একবার সুপ্রীতির সঙ্গে দেখা করতে চায়। তার সঙ্গে কথা বলতে চায়। মৃত্যুর আগে একটি প্রশ্নের উত্তর পেয়ে যেতে এখনো বড় সাধ বিমলেন্দুর।

বড় পুরোন প্রশ্ন। গত দশ বছর ধরে নানাজায়গায়, নানা অবস্থায় এই একই প্রশ্ন সুপ্রীতিকে সে বারবার করে এসেছে। সুপ্রীতি কখনো বা নিরুত্তর রয়েছে কখনো উত্তর দিলেও সদুত্তর দেয়নি। কেন দেবে?

বিমলেন্দুর কাছে সুপ্রীতির আর তো গোপন করবার কিছু ছিলনা, কোন রহস্য অনুদ্‌ঘাটিত রাখতে পারেনি। শুধু ওই একটিমাত্র কথা ছাড়া। সেই কথাটিকে পরম যত্নে, অতি সন্তর্পনে সিন্দুকের মধ্যে গোপন ঝাঁপিতে মুখ এঁটে বন্ধ করে রেখেছে সুপ্রীতি। সে ঝাঁপি সুপ্রীতি নিজে। যে রত্ন রেখেছে তা সতীত্ব নয়। হয়তো কোন রত্নই নয়। কিন্তু রত্নের চেয়েও তা বেশি রহস্যময়। অন্তত বিমলেন্দুর চোখে।

তিনদিন আগেও সুপ্রীতিকে একা পেয়ে বিমলেন্দু সেই পুরোন প্রশ্ন তুলেছিল। রোগশয্যা থেকে তার শীর্ণ হাতখানা বাড়িয়ে সাদরে তুলে নিয়েছিল সুপ্রীতির হাত। সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করেছিল, 'বলবে? আজ বলবে সেই কথাটা?'

সুপ্রীতি বুঝতে পেরেও বলেছিল, 'কোন কথা?'

বিমলেন্দু অধীর আর অসহিষ্ণু সুরে বলেছিল, 'কোন কথা তুমি তা জানো। জেনেও না জানার ভান করছ।'

ভান করবার অধিকার যেন শুধু বিমলেন্দুরই আছে।

আগের মতই সভয়ে একবার ঘরের চারদিকে চোখ বুলিয়ে নিয়েছিল সুপ্রীতি। না কেউ দেখতে পায়নি, কেউ শুনতে পায়নি, পেলেও রোগীর প্রলাপ আর বিকার ছাড়া কেউ কিছু ভাববে না। এ অবস্থায় সবাই তাকে ক্ষমা করবে। এমন কি বিমলেন্দুর স্ত্রী ইন্দিরাও এখন স্বামীকে সুপ্রীতির সঙ্গে কয়েক মিনিটের নিভৃত আলাপের সুযোগ দেয়। ফাঁসীর আসামীর শেষ সাধ পূরণ হোক। দুদিন বাদে যে চলে যাবে সে যদি একটু কুপথ্য করে করুক। মনে মনে হাসে সুপ্রীতি। সে তো শুধু বস্তু নয়, শুধু মাংস পিণ্ড নয়। বিমলেন্দু হয়তো একদিন তাকে তাই ভেবেছিল। কিন্তু রক্তে মাংসে গড়া এই দেহের মধ্যেই মানুষের প্রাণ আছে, রুচি অরুচি তৃষ্ণা বিতৃষ্ণা আছে।

বিমলেন্দুর কথার জবাবে সুপ্রীতি বলেছিল, 'আজ নয়; আর একদিন বলব।'

বিমলেন্দু একটু হাসির চেষ্টা করেছিল, 'আর একদিন? দিন তো ফুরিয়ে এল সুপ্রীতি।'

সুপ্রীতি মিথ্যা আশ্বাস দিয়ে বলেছিল, 'না না ফুরোবে কেন?'

কিন্তু বিমলেন্দু নিজেও তো ডাক্তার। বাঁচবার আশা যে আর নেই তা কি সে আর নিজেই জানেনা? ক্যানসার একিউট ষ্টেজে এসে পৌঁছলে তার আর ওষুধ মেলেনা। হয়তো ভবিষ্যতে একদিন মিলবে। কিন্তু ততদিনে বিমলেন্দুর কোন চিহ্নই আর অবশিষ্ট থাকবে না। তার বাড়ি থাকবে, গাড়ি থাকবে স্ত্রীর আর মেয়ের সঙ্গে সুদক্ষ হৃদরোগ বিশারদ হিসাবে অল্প কিছু খ্যাতিও হয়তো কয়েক বছরের জন্য থেকে যাবে। কিন্তু বিমলেন্দুর এই মরদেহ আর থাকবে না। দেহের সঙ্গে দূর হবে দেহ রোগ।

একটু অকালে আকস্মিক ভাবেই বিদায় নিচ্ছে বিমলেন্দু। পঞ্চশোর্ধ বানপ্রস্থের বয়স হ'তে পারে, কিন্তু মহাপ্রস্থানের বয়স নয়। বানপ্রস্থের কোন উদ্দেশ্য ছিল না বিমলেন্দুর। সে এই নগরেই নিজের শ্রী সম্পদ খ্যাতি কীর্তিকে বাড়িয়ে তুলছিল, হঠাৎ বিদায়ের ডাক এসে গেল।

বিমলেন্দুর দিকে তাকিয়ে একটু মমতা হয়েছিল সুপ্রীতির। সবেমাত্র, কানের কাছে কয়েক গাছি চুলে পাক ধরেছে। মাথায় ঘন মসৃণ কালো কালো চুলের রাশের মধ্যে সবে মাত্র দু'একটি রূপালি রেখা দেখা যাচ্ছে। কিন্তু এখনো একটি দাঁতও পড়েনি, স্নিগ্ধ চিক্কণ গৌরবর্ণ একটু যদি ম্লান হয়ে থাকে তা নিতান্তই রোগভোগের জন্যে। যৌবনের তীক্ষ্ণ বুদ্ধি উজ্জ্বল দু'টি চোখের কোণে যে পাণ্ডুর ছায়া দেখা যাচ্ছে তা জরার নয়, মৃত্যুর। চেয়ে চেয়ে হঠাৎ মমতায় ভরে উঠে ছিল সুপ্রীতির মন। কিসের এক অমৃত স্পর্শে স্পন্দনহীন অতীতের স্মৃতি স্তূপে যেন নতুন প্রাণের সাড়া জেগেছিল। নিবন্ত দীপ গুলির মুখ আবার আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছিল। মুহূর্তের মধ্যে সব ভুলে গিয়ে ছল ছল চোখে সুপ্রীতি প্রতিশ্রুতি দিয়ে বসেছিল, 'বলব, নিশ্চয়ই

বলব। আজ তো আর সময় নেই। পরে যে দিন আসবো সেদিন নিশ্চয়ই বলে যাব।'

বিমলেন্দু ক্লান্তস্বরে বলেছিল, 'বেশি দেরি কোরনা যেন, বেশি দেরি কিন্তু সইবে না।'

আর তারপরেই হঠাৎ রোগ যন্ত্রণায় আর্তনাদ করে উঠেছিল বিমলেন্দু। সঙ্গে সঙ্গে ডাক্তার আর নার্স ছুটে এসেছিল। এসে পৌঁছেছিল বিমলেন্দুর স্ত্রী আর মেয়ে। তারা সবাই অদ্ভুত চোখে তাকিয়েছিল সুপ্রীতির দিকে। রোগীর হঠাৎ এই যন্ত্রণাবৃদ্ধির মূলে যেন সুপ্রীতিই রয়েছে।

একজন ছোকরা হাউস সার্জন তার দিকে তাকিয়ে সৌজন্য ঢাকা তিরস্কারের ভঙ্গিতে বলেছিল, 'মিসেস চক্রবর্তী, আপনি কি দয়া করে একটু —।'

অপ্রস্তুত হয়ে সুপ্রীতি তাড়াতাড়ি বাইরে চলে এসেছিল। ডাক্তাররা শুধু দেহের যন্ত্রণাই দেখে, দেহের যন্ত্রণাই বোঝে! আর কিছু টের পায় না।

বেশি দেরি করেনি সুপ্রীতি। মাত্র তিনদিন পরেই ফিরে এসেছে। তাড়াতাড়ি আসতে গিয়ে ভিজিটিং আওয়ার্সের প্রায় ঘণ্টা দেড়েক আগেই এসে হাজির হয়েছে ভবানীপুরের এই ছোট সুরম্য ক্যানসার হাসপাতালে। খানিকটা আগেই এসেছে সুপ্রীতি। বিমলেন্দুর আত্মীয় স্বজন কেউ এসে পড়বার আগে পাঁচ মিনিটের মধ্যে কথাটা বলে সে আজ চলে যেতে চায়। কিন্তু এত আগে কোন ডাক্তার কি নার্স তাকে রোগীর ঘরে ঢুকতে দিতে চায় না সুপ্রীতির জরুরী কথা থাকা সত্ত্বেও নয়। তার চেয়েও জরুরী কাজ আছে ডাক্তারদের। রোগীর সম্বন্ধে এখনও তাঁদের যথেষ্ট দায়-দায়িত্ব। রোগী তো সাধারণ রোগী নয়, খ্যাতনামা চিকিৎসক। তাঁর ওপর অযত্ন হলে হাসপাতালের দুর্ণাম হবে।

তাই নির্দিষ্ট সময় না আসা পর্যন্ত সুপ্রীতিকে এই ঘরে একা বসে

থাকতে হচ্ছে। মাঝে মাঝে চোখে পড়ছে সিঁড়ি দিয়ে দু' একজন ডাক্তার নার্সের ওঠানামা। তাদের মুখে গাম্ভীর্য, চলনে ব্যস্ততা! একজন ডাক্তারকে ইতিমধ্যে সুপ্রীতি একবার জিজ্ঞাসা করেছে, 'কেমন আছেন ডক্টর হালদার?'

জবাব এসেছে, 'একই রকম।'

এ জবাব জেনেও দেওয়া যায়, না জেনেও দেওয়া যায়।

কিন্তু সুপ্রীতির নিজের জবাব অত সহজ নয়। বিশেষ করে মৃত্যু-পথ যাত্রীর কাছে। কী ভাবে কী ভাষায়, কণ্ঠে কতটুকু কোমলতা এনে কথাটা বলবে সুপ্রীতি তা সে আজ তিনদিন ধরে ভেবেও কোন কূলকিনারা পায়নি।

বিমলেন্দু যে বাঁচবেনা সে সম্বন্ধে আর কারোরই কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু তার জিজ্ঞাসার সত্যিকার জবাবটা সুপ্রীতির পক্ষে দেওয়া সঙ্গত হবে কিনা, তাতে মৃত্যু যন্ত্রণা কাতর রোগীর মনে কোন শান্তি আসবে কিনা তাতে এখনো সংশয় রয়েছে। ভাবাবেগে ভেসে যাওয়ার বয়স সুপ্রীতি পার হয়ে এসেছে। দু' বছর হলো ছাড়িয়ে গেছে চল্লিশের সীমানা। ডাক্তারের মত অত বেশি না হলেও সেও জগতের অনেক ব্যাপার দেখেছে শুনেছে। অভিজ্ঞতায় শক্ত হয়ে গেছে তার হৃদয়! তাছাড়া সংসারে সমাজে সুপ্রীতিরও কিছু মর্যাদা আছে। সে আজ তিনটি ছেলেমেয়ের মা। বড় ছেলে অনার্স নিয়ে বি, এ, পাশ করেছে। যাদবপুরের একটি নাতিখ্যাত হাই স্কুলের সুপ্রীতি এখন হেড মিস্ট্রেস। পদমর্যাদা তারও আছে। সেই বারো বছর আগের সুপ্রীতি আর নেই। কিন্তু স্মৃতি আছে। স্মৃতি এত তাড়াতাড়ি নষ্ট হবার নয়।

পূজোর ছুটি শুরু হতে না হতেই স্বামী আর ছেলে-মেয়েরা রাঁচিতে চলে গেছে হাওয়া বদলাতে। সুপ্রীতির অত তাড়াতাড়ি যাওয়া হয়নি। স্কুলের কাজের জন্যে সে আটকে পড়েছে। তবু দু-তিনদিনের মধ্যেই তার চলে যাওয়ার কথা। আট বছরের মেয়ে পর্ণা এর মধ্যে

দু'খানা চিঠি লিখেছে, 'মামণি, শিগগির চলে এসো। তোমাকে ছাড়া একটুও ভালো লাগছেনা।'

দুষ্টু মেয়ে। তখন এত করে বলা হল, 'তুই থাক। আমার সঙ্গে যাবি।' কিন্তু মেয়ে কিছুতেই শুনলনা। তখন বাবাই তার সব চেয়ে আপন। অবশ্য সুপ্রীতির ননদ উমাও গেছে সঙ্গে। কোনও অযত্ন হবে না ছেলে মেয়েদের।

স্কুলের কাজ অনেক আগেই মিটে গেছে। টিচারদের মাইনেপত্র মিটিয়ে দিয়েছেন সেক্রেটারী। তা সত্বেও সুপ্রীতি কলকাতা ছেড়ে নড়তে পারছেনা। বিমলেন্দুর কখন কি হয় কিছু ঠিক নেই। তার আগে একটি পুরোন প্রশ্নের জবাব দিয়ে যেতে হবে।

প্রশ্নটি বড় অদ্ভুত অসঙ্গত আর অশোভন। 'সুপ্রীতি, তুমি যদি ধরা দিয়েই ছিলে, অত তাড়াতাড়ি ছেড়ে গেলে কেন?'

কিন্তু ছাড়াছাড়ি হয়ে যাওয়ার পর কোন ভদ্রলোকে কি ও প্রশ্ন করে? সে কি মেনে নেয়না যে ও ধরণের সম্পর্ক চিরদিন অস্থায়ীই হয়ে থাকে? বিশেষ ক'রে দুজনেরই যখন আলাদা আলাদা সংসার আর মান সম্মান আছে? কিন্তু বিমলেন্দু ডাক্তার সব সময় ভদ্রতার ধার ধারেনি। সে বড় অবুঝ অশান্ত আর উদ্দাম। তার ধারণা ছিল মেয়েদের ধরে রাখতে হলে গায়ের জোর আর টাকার জোরই যথেষ্ট। সুপ্রীতি তার সেই ধারণা ভেঙে দিয়েছে।

'ছেড়ে গেলে কেন?' তার চেয়েও দুরূহ প্রশ্ন হতে পারত, 'ধরা দিলে কেন?' এতে বিস্ময় আরো বেশি। কিন্তু কোনদিন এ বিস্ময় বিমলেন্দুর মনে জাগেনি। কোনদিন একথা জিজ্ঞেস করতে তার ইচ্ছা হয়নি। কিন্তু সে না করলেও সুপ্রীতি অনেকদিন অনেকবার নিজেকে ও কথা জিজ্ঞাসা করেছে। সেই আত্মবিস্মৃতির কথা স্মরণ করে লজ্জা পেয়েছে, নিজেকে ধিক্কার দিয়েছে। তবু তো সে স্মৃতি মুছে যায়নি।

আজও মনে পড়ে আলীপুরের কৃষ্ণচূড়া গাছের পিছনে লাল রঙের সেই দোতালা ফ্লাট বাড়িটির কথা। পাশাপাশি দুটি ফ্লাটে

থাকত বিলাত ফেরত ডাক্তার বিমলেন্দু হালদার আর জজ কোর্টের উকিল সুধাংশু চক্রবর্তী। দু'জনের প্রায় একই বয়স, পঁয়ত্রিশ—ছত্রিশ। জাতে দু'জনেই ব্রাহ্মণ। প্রতিবেশী হিসেবে আলাপ পরিচয় হওয়ার পর ধরা পড়ল দু'জনে তারা কিছুদিন সহপাঠীও ছিল। প্রেসিডেন্সীতে একই সেকসনে আই, এস, সি, পড়েছে। কিন্তু পরীক্ষার ফল আশানুরূপ না হওয়ায় সুধাংশু বি, এ, তে গিয়ে ভর্তি হয় আর বিমলেন্দু চলে যায় মেডিক্যাল কলেজে।

পূর্বপরিচয় উদঘাটিত হওয়ার পর সুধাংশু বলল, 'আশ্চর্য আপনি সেই বিমলেন্দু বাবু। আপনার চেহারা তো বিশেষ কিছু বদলায়নি।'

বিমলেন্দু হাসিমুখে বলল, বাবু টাবু আবার কেন। মনে আছে আমরা তখন একজন আর একজনের তুমি ছিলাম।'

সুধাংশু আগের কথা মনে করবার চেষ্টা করে হেসে বলল, 'তাই নাকি? ঠিক ভালো করে মনে পড়ছেনা। আঠের উনিশ বছর হয়ে গেল। সে কি আজকের কথা?'

বিমলেন্দু বলল, 'আজ না হলেও কালকের কথা। আঠের উনিশ বছর জীবনের পক্ষে এমন কিছু বেশি সময় নয়। আমরা শতায়ু হবো বলে স্পর্ধা রাখি। ওই কটা বছর তো সিকি শতাব্দীর কাছে গিয়েও পৌঁছায় না। কিন্তু এই অল্প সময়ের মধ্যে তুমি বড় বেশি বদলে গেছ সুধাংশু। এরই মধ্যে আধখানা মাথা জুড়ে দিব্যি একটি চকচকে টাক বাগিয়ে বসেছ। তবু তো ভুড়িটি বাগাতে পারনি।'

সুধাংশুর ঘরে বসেই কথা হচ্ছিল। তক্তপোশে বসে বুটপরা পা দু'খানি দোলাতে দোলাতে বন্ধুকে ঠাট্টা করছিল বিমলেন্দু। তা দেখে সুপ্রীতির ছেলেমেয়ে দুটি মুখ মুচকে হাসছিল। সে নিজেও মুখে আঁচল না চেপে পারেনি।

তাকে হাসতে দেখে বিমলেন্দু বন্ধুকে ছেড়ে বন্ধুপত্নীর দিকে মুখ ফিরিয়েছিল, 'শুধু হাসলে চলবে না। সত্যিকরে বলুন আমি ঠিক

বলেছি কিনা। আপনার স্বামীরত্নটি বোধহয় ইচ্ছে করেই অমন বুড়োটে চেহারা করে রেখেছে। নইলে মক্কেল কাছে ঘেঁষে না।'

সুপ্রীতির মুখ থেকে ফস করে বেরিয়ে গিয়েছিল, 'আপনি বুঝি ভেবেছেন এতেও মক্কেল খুব কাছে ঘেঁষে ?'

বিমলেন্দু আসবাব-বিরল ঘরখানার দিকে একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে একটু থেমে বলেছিল, 'সে জন্যে ভাববেন না। আমার কিছু খদ্দের লক্ষ্মী আছে। এবার থেকে তাদের জোর করে ধরে নিয়ে আসব। তবে মামলাটা আপনাকে বাঁধিয়ে দিতে হবে। খুব চেষ্টা করতে হবেনা। আপনিই বেঁধে যাবে। তারপর সুধাংশুর মুখ আর কপালের জোর।'

সুপ্রীতি হেসে বলেছিল, 'ডাক্তারির সঙ্গে সঙ্গে এ ধরণের দালালি টালালিও করেন নাকি ?'

বিমলেন্দু হেসে বলেছিল, 'করি বই কি ? না করলে এ বাজারে টিঁকে আছি কি ক'রে।'

টিঁকে থাকবার মূল মন্ত্রটা বিমলেন্দু যেমন জানে, সুধাংশু তেমন জানেনা। এ তুলনাটা সুঁচের মত সুপ্রীতির মনে যে বিঁধেছিল তাতে কোন সন্দেহ নেই। সুধাংশু এতকাল জজ কোর্টে ঘষে ঘষেও উপার্জনটাকে ভদ্ররকমের পর্যায়ে নিয়ে যেতে পারেনি। পুরোন জুতো পুরোন স্যুট দেখেই তা বোঝা যায়। এই বয়সেই সব রকম আনন্দ উৎসাহ খুইয়ে জীবনটাকে যেন একখানা ছ্যাকড়া গাড়ির মত অতিকষ্টে টেনে নিয়ে চলেছে সুধাংশু। আর তারই পাশে তারই ঠিক সমবয়সী বিমলেন্দু যেন একখানি ধারালো ইস্পাত। খাপখোলা তরোয়ালের মত। শুধু চেহারায় নয়, চালে চলনে ভাষায় ভঙ্গিতে সে একেবারে অনন্য। প্রায় দু বছর ধরে তলোয়ারের সেই গোপন আঘাত সহ্য করল সুপ্রীতি। কিন্তু তখনো তার বর্ম অটুট। তখনই সে বিমলেন্দুকে চিনেছে। অত বেশি ঝক ঝক করলেও তার সবখানি যে সোনা নয় তা বুঝতে পারার মত বয়স হয়েছিল সুপ্রীতির। মাঝে মাঝে কানে

গিয়েছিল স্বামী স্ত্রীর গোপন কলহ। ইন্দিরার মুখ থেকে যে দু' একটি মেয়ের নাম সে হঠাৎ শুনে ফেলেছিল তা যে বিমলেন্দুর নার্স কিংবা ছাত্রীর তা আন্দাজ করা কঠিন ছিলনা।

তবুও চিকিৎসকের সাফল্যের পক্ষে তা মোটেই বাধা হয়নি। পৈতৃক বিত্ত কিছু আগে থেকেই সঞ্চিত ছিল। নিজের রোজগারে তা আরো বাড়িয়ে চলল বিমলেন্দু। জমি কিনল হিন্দুস্থান পার্কে। গাড়ি কিনল।

কিন্তু আশ্চর্য এত খ্যাতি প্রতিপত্তি হওয়া সত্ত্বেও বিমলেন্দু সেই কম দামী ছোট ফ্লাটে রয়ে গেল। কিছুতেই বাড়ি বদলাল না।

সুপ্রীতি একদিন হাসতে হাসতে বলল, 'গগন নহিলে তোমাকে ধরিবে কেবা। আপনার মত বড় ডাক্তারকে এত ছোট বাড়িতে কি আর মানায় ?'

বিমলেন্দু বলল, 'আপনার মুখে অন্তত ও ঠাট্টাটা মানায় না। এখনো অত মোটা হইনি যে দরজা দিয়ে ঢুকতে পারব না।'

সুপ্রীতি বলল, 'আহা মানুষ বুঝি শুধু দেহেই মোটা হয় ?'

বিমলেন্দু হেসে বলল, 'আর তো হয় বুদ্ধিতে।'

সুপ্রীতি বলল, 'আপনি সেদিক থেকেও দারুণ সরু।'

বিমলেন্দু স্বীকার করে বলল, 'দেখবার চোখ আপনার আছে। তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছাড়া বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা ধরা পড়ে না। কিন্তু আপনিও তো তাই। দেহে আর বুদ্ধিতে তন্বী। আমার গিন্নীর মত শ্রীমতী বসুমতী নন।'

ইন্দিরা কিছুটা স্থূলাঙ্গী। গায়ের রঙ শামলা। কিন্তু মুখশ্রী সুপ্রীতির চেয়েও সুন্দর। ঘরকন্নায় নৈপুণ্য আছে। ধীর শান্ত স্বভাবের মেয়ে। সুপ্রীতি মৃদু হেসে বলল, 'আমার কর্তা কিন্তু আপনার স্ত্রীর খুব প্রশংসা করেন।'

বিমলেন্দু বলল, 'আর আমার স্ত্রীর কর্তা যে তার প্রতিবেশিনীর সুখ্যাতিতে পঞ্চমুখ তা বুঝি আপনার কর্তা জানেন না ?'

খ্যাতিতে বিত্তে বিমলেন্দু সব দিক থেকে বড় হওয়া সত্ত্বেও গরীব বন্ধু আর বন্ধুপত্নীর সঙ্গে মাখামাখি বাড়িয়েই চলল। সে প্রায়ই সুধাংশুকে সপরিবারে নিমন্ত্রণ করে খাওয়ায়, থিয়েটার সিনেমার টিকিট নিয়ে আসে। নিজের গাড়িতে করে সুপ্রীতিকে ছেলেমেয়ে শুদ্ধ তার বাপের বাড়িতে পৌঁছে দেয়। সুপ্রীতির কোন আপত্তি শোনে না। বিমলেন্দুর মধ্যে যে জবরদস্তির ভাব আছে পাছে তা একেবারেই সীমা ছাড়ায় তাই সুপ্রীতি তার ছোট খাট অনুরোধ রক্ষা করে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই তার মনে হয় কাজটা ভালো হচ্ছে না, বিমলেন্দুর লোভ বেড়ে যাচ্ছে। একদিন গাড়িতে যেতে যেতে নিজের বাটন হোলের রক্ত গোলাপ সুপ্রীতির খোপায় গুঁজে দিয়ে বলল, 'লাল গোলাপ কালো চুলের মধ্যের যেমন হাসিমুখে থাকে তেমন আর কোথাও নয়।' রক্ষা সেদিন বড় ছেলে অঞ্জন সঙ্গে ছিল না। ছিল ঝর্ণা। তখন তার বয়স পাঁচের বেশি নয়। তবু কেন যে সে অপ্রসন্ন হয়ে মুখখানা পাঁচের মত করে রইল তা ঠিক বোঝা গেলনা।

সুপ্রীতি আঁচল খানা ফের মাথায় তুলে দিতে যাচ্ছিল বিমলেন্দু তার হাতখানা টপ করে ধরে ফেলে বলল, 'থাক আর দরকার নেই। আমাকে দেখলেই আপনার খাটো আঁচল বার বার পড়ে, বার বার ওঠে। তার ফল আমার পক্ষে আরো মারাত্মক হয়।'

বিমলেন্দু এমন ভঙ্গিতে এসব কাণ্ডকারখানা করত যেন বন্ধুর স্ত্রীর সঙ্গে সামাজিক ঠাট্টা তামাসার সম্পর্কই সে রক্ষা করে চলেছে। কিন্তু ব্যাপারটা যে ঠাট্টার চেয়ে অনেক বেশি, তা তার স্পর্শের উত্তাপে, কথার ব্যঞ্জনায়, চোখের উজ্জ্বলতায় ধরা পড়তে লাগল।

তারপর সুপ্রীতিও একদিন ধরা দিতে বাধ্য হল। একথা বলা মিথ্যা যে বিমলেন্দুর বাহুবল আর বুদ্ধিবলের জন্যই ধরা দিল। নিজের কাছে একথা স্বীকার করতে সুপ্রীতি আজ অপমান বোধ করে না শুধু অন্যের ইচ্ছার কাছে না, নিজের বাসনার কাছেই সে অল্পদিনের জন্যে আত্মসর্পণ করেছিল। বশ হয়েছিল সে আপন বাসনার। সে তো

তখন আর চতুর্দশী অবুঝ কিশোরী ছিলনা যে বিমলেন্দু তাকে পথ ভুলিয়ে নেবে। সুপ্রীতি তখন পূর্ণবয়স্কা নারী। স্ত্রী হিসাবে, মা হিসাবে সংসারে তার সুদৃঢ় প্রতিষ্ঠা, তবু বিমলেন্দুর সঙ্গে সে যে গোপন সম্পর্কের রঙীন সুতোয় কেন জড়িয়েছিল সুপ্রীতির নিজের কাছেই তা এক বিস্ময়কর প্রশ্ন। এই প্রশ্নের সদুত্তর সে আজও পায়নি।

কিন্তু সেই উদ্দীপনা উন্মাদনা ভরা এক অদ্ভুত অনুভূতির স্বাদ আজও ভুলতে পারেনি সুপ্রীতি। নতুন রূপ নতুন রঙ ধরেছিল দুনিয়ার। মনে হয় বিমলেন্দু ছিল শুধু উপলক্ষ। লক্ষ্য ছিল নিজের জন্মান্তর, রূপান্তর। যেন এ ঘর থেকে ও ঘরে অভিসার নয়, যেন গ্রহ থেকে গ্রহান্তরে দুঃসাহসিক অভিযাত্রা।

তারপর জীর্ণতা ধরা পড়ল। পুনরাবৃত্তির ক্লান্তি এল। উপপতির মধ্যেও সেই পতিরই আধিপত্য স্পৃহা দেখতে পেল সুপ্রীতি। বুঝতে পারল বিমলেন্দুর গ্রহনক্ষত্রের অভাব নেই। নিষ্ঠা বলে কোন বস্তুকে বিমলেন্দু স্বীকার করতে চায় না। কিংবা চাইলেও পারে না। ওর স্বভাবের মধ্যে তা নেই।

কিন্তু বিমলেন্দু শক্তিমান পুরুষ। নিজের স্বভাবের এই বিকৃতিকে সে নিজের খ্যাতি কীর্তি আর অর্থ সম্পদ দিয়ে ঢাকল। বাড়ি করল, গাড়ি করল, সোনার ভরিতে স্ত্রীর ওজন ভারি করল। ইন্দিরার নামে সম্পত্তি হল, ব্যাঙ্ক ব্যালান্স হল।

দেখে দেখে সুপ্রীতি হঠাৎ একদিন নিজেকে জোর করে ছিনিয়ে নিয়ে এল। বিমলেন্দুর কাছে কোন রকম আনুষ্ঠানিক বিদায় নিলনা। বন্ধন ছিন্ন করবার কোন কারণ দেখালনা। শুধু নিজেকে ছিনিয়ে নিয়ে এল। বিমলেন্দু উঠে গেল তার নতুন বাড়িতে। সুপ্রীতি রয়ে গেল তার পুরোন বাসায়। দুই পরিবারের মধ্যে সেই সামাজিক সম্পর্ক টুকুকে নিজের হাতে নিঃশেষে মুছে দিল সুপ্রীতি। বিমলেন্দুর মুঠির ভিতর থেকে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন মেয়ে বোধহয় এমন করে সরে যায়নি।

কারণ না দেখিয়ে, কৈফিয়ৎ না দিয়ে যায়নি। তাই বোধহয় বিমলেন্দুর চোখ সুপ্রীতির মধ্যে আজও এক ফোঁটা বিস্ময় এক বিন্দু রহস্য দেখতে পায়। সেই বিন্দু প্রমাণ রহস্যের কোন কূল কিনারা পায় না। তাই মৃত্যুর পূর্বেও এই একটি প্রশ্নের সত্য উত্তর জেনে যাওয়ার জন্যে বিমলেন্দুর আকুলতার সীমা নেই।

তারপর থেকে সামাজিক নিমন্ত্রণ আমন্ত্রণে পার্টিতে পিকনিকে যেখানে যখনই সুপ্রীতিকে নির্জনে পাওয়ার সুযোগ পেয়েছে বিমলেন্দু —অনেক সময় চেষ্টা করে সুযোগ সৃষ্টি করে নিয়েছে, তখনই ঘুরিয়ে ফিরিয়ে ওই একই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেছে, 'কেন চলে গেলে। শুধু জবাব দাও। জবাব ছাড়া আমি আর কিছু চাইনে।'

কখনো শাসন কখনো অনুনয়, কখনো তাদের সেই অল্পকাল স্থায়ী প্রণয়ের দোহাই দিয়ে জবাব দাবি করেছে বিমলেন্দু। সুপ্রীতিও কখনো অবজ্ঞায় নিরুত্তর রয়েছে, কখনো বা তিরস্কারের সুরে বলেছে, 'নিজের মনেই খুঁজে দেখ। জবাব পাবে। সব কথার জবাবই মানুষ নিজের কাছে পায়।'

বিমলেন্দু তবু জানতে চেয়েছে, 'ধরা পড়বার ভয়ে?'

সুপ্রীতি বলেছে 'হয়ত।'

বিমলেন্দু তবু জিজ্ঞাসা করেছে, 'নাকি আমার ওপর ঘৃণায়? আমার বহুচারিতায় তোমার ঈর্ষ্যা হয়েছিল?'

সুপ্রীতি বলেছে, 'হতে পারে।'

'নাকি সমাজ সংসারের কাছে নিজের মান সম্ভ্রম বজায় রাখবার জন্যে?'

সুপ্রীতি পরম ঔদাস্যে বলেছে, 'তাইতো স্বাভাবিক!'

বৈজ্ঞানিক কৌতূহল নিয়ে বিমলেন্দু যখন জিজ্ঞাসা করেছিল, 'কিন্তু এর মধ্যে কোন কারণটি ঠিক?'

সুপ্রীতি নিষ্ঠুর ভাবে জবাব দিয়েছে, 'যে কোন একটি কিংবা এক-সঙ্গে সব কটি। যা তোমার খুসি তাই ভেবে নিয়ো। জবাবটা তো

তোমার নিজের জন্যেই আর কারো জন্যে তো নয়। নিজের মনঃপূত হলেই হল।'

তারপর বিমলেন্দুকে শাসনও করেছিল, 'ফের যদি তুমি ওসব কথা তোল সাধারণ সামাজিক সম্পর্ক রাখাও আর আমাদের মধ্যে সম্ভব হবেনা।'

বিমলেন্দু ম্লানমুখে বলেছিল, 'আচ্ছা, আর এমন অপরাধ করবনা।'

অত পরাক্রান্ত বহুবল্লভ পুরুষকে অমন নির্মম ভাবে আঘাত করতে পেরে খুসি হয়েছিল সুপ্রাতি। কিন্তু শুধু কি খুসিই হয়েছিল? একজনের অমন মহিমাকে অমন করে চূর্ণ বিচূর্ণ করে দেওয়ার পর একটু বেদনার ছায়াও ঘনিয়েছিল তার চোখে। বলেছিল, 'কেন নিজেকে বার বার আমার হাত দিয়ে অপমান করাচ্ছ, আমার মুখ থেকে জোর করে কটুকথা বার করে নিচ্ছ? এতে যে তোমার অসম্মান তা কি তুমি বুঝতে পারনা?'

তখনকার মত ফিরে গিয়েছিল বিমলেন্দু। কিন্তু একেবারে যায়নি। সুপ্রীতির আঘাত আর সহানুভূতিই বোধ হয় তাকে বার বার টেনেছে, বারবার একই অসঙ্গত প্রশ্ন করিয়ে নিজেকে অপমানিত আর বিব্রত করে ছেড়েছে।

কিন্তু সুপ্রাতি শুধু একজন কামাতুর পুরুষকে অনুকম্পা জানাবার জন্যে পৃথিবীতে আসেনি, শুধু একজনের চোখে একটি বিস্ময়ের বিন্দু হয়ে বেঁচে থাকতে চায়নি। সঙ্কল্পে নিষ্ঠায় অধ্যবসায়ে সে আরো বিস্ময়ের সৃষ্টি করেছে। স্বামী ছেলেমেয়ে আত্মীয় স্বজন বন্ধু বান্ধব সকলের কাছে এক বিস্ময়কর মর্যাদার প্রতিষ্ঠা করেছে। দরিদ্র স্বামীর সংসার চালিয়ে ছেলে মেয়ের লালনপালন শিক্ষা দীক্ষার দায়িত্ব নিয়েও সে ঘরে বসে বি, এ, পাশ করেছে, এম, এ, পাশ করেছে, ট্রেনিং কলেজ থেকে বি, টি, ডিগ্রী নিয়ে একটি স্কুলের কর্তৃত্ব গ্রহণ করেছে। নিজের উপার্জনের সাহায্যে স্বামীর সংসারকে স্বচ্ছল, জীবনকে স্বাচ্ছন্দ্যময় করে তুলেছে।

একথা সুপ্রীতি অস্বীকার করেনা কামকে কীর্তি দিয়ে ঢাকবার, অনুতাপকে উত্তাপে পরিণত করবার এই জেদ আর জাদু সে শিখেছে বিমলেন্দু ডাক্তারের কাছ থেকে। বিমলেন্দু শুধু দৈহিক সান্নিধ্যই তাকে দেয়নি, মানসিক দৃঢ়তায়ও দীক্ষিত করেছে। সব কেড়ে নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বিমলেন্দু তাকে বারবার বলেছে 'প্রীতি তুমি বড় হও, বড় হও। শুধু ঘরের কোণে মৃৎপ্রদীপ হয়ে থাকবার জন্যে তুমি আসনি।'

হয়ত বিমলেন্দুর সব কথায় আন্তরিকতা ছিল না। বেশির ভাগ মুহূর্তই ফ্লার্টিং-এ ভরা ছিল। কিন্তু সেই কথাগুলিকে মন্ত্রের মত গ্রহণ করেছে সুপ্রীতি, মন্ত্রের মত অমোঘ আর অব্যর্থ কবে তুলেছে।

তাইতো বিমলেন্দুকে ঘৃণা করা সত্ত্বেও একেবারে ত্যাগ করতে পারেনি সুপ্রীতি। তার মৃত্যুশয্যার আহ্বান উপেক্ষা করতে পারেনি।

অতবড় বৈজ্ঞানিক হয়েও নিজের অমিতাচারের শাস্তি প্রকৃতির হাত থেকে মাথা পেতে নিতে হয়েছে বিমলেন্দুকে। দুরারোগ্য ক্যানসারে যে তাকে আক্রমণ করেছে, ছিন্ন ভিন্ন করে ফেলেছে এ তার নিজের উচ্ছৃঙ্খলতার ফল। তাতে কোন সন্দেহ নেই সুপ্রাতির। একথা সে বিমলেন্দুর সহকর্মীদের মুখেও শুনেছে। তবু তার পতন সুপ্রীতির কাছে, ছোট পরিধির মধ্যে একটি ছোট মাপের বটগাছের অকাল উচ্ছেদের মত। সবাই স্বীকার করেছে চিকিৎসা বিজ্ঞানে বিমলেন্দুর আরো কিছু দেবার ছিল। নিজের দুর্বুদ্ধিতে সে অকাল-মৃত্যু ঘটিয়েছে। আগে মনের মূর্ছা তারপরে দেহের মৃত্যু। বিমলেন্দু অভিশপ্ত।

হাসপাতালের একজন তরুণ ডাক্তারের এবার একটু দয়া হল সুপ্রীতিকে দেখে। সে এগিয়ে এসে বলল, 'আপনি অনেকক্ষণ ধরে বসে আছেন। যান এবার দেখা করে আসুন। ডক্টর হালদারও আপনার খোঁজ করছিলেন। আপনার নামই তো সুপ্রীতি দেবী?'

সুপ্রীতি বলল, 'হ্যাঁ। আর কেউ এখনো আসেনি?'

তরুণ ডাক্তার কি বুঝল কে জানে। গম্ভীর মুখে বলল, 'না, আর কেউ এখনো আসেননি। তবে বোধ হয় মিনিট দশেকের মধ্যেই এসে পড়বেন। আপনি যান, দেখা করে আসুন।'

সুপ্রীতি মনে মনে ভাবল দশ মিনিটের দরকার নেই, দশ সেকেণ্ডই যথেষ্ট।

ষ্টাফ নার্স নিজে পথ দেখিয়ে নিয়ে গেলেন সুপ্রীতিকে। নির্জন করে দিলেন কেবিন দুজনের জন্যে। রোগীর সামনের টুলটার ওপর সুপ্রীতি এসে বসল।

বিমলেন্দুর যন্ত্রণাকাতর মুখে একটু যেন হাসি ফুটল। মৃদু প্রেম-গুঞ্জনের মত অস্ফুট স্বরে বলল, 'এসেছ! তৈরী হয়ে এসেছ?'

সুপ্রীতি নির্লিপ্ত নৈর্ব্যক্তিক ভঙ্গিতে বলল, 'হ্যাঁ, বলবার জন্যে তৈরী হয়ে এসেছি। তুমি আর একবার জিজ্ঞাসা করো।'

বিমলেন্দু বলল, 'জিজ্ঞাসা! জিজ্ঞেস করবার আগে আর একটা কথা বলি। তোমার কি মনে আছে সুপ্রীতি আমি তোমাকে বলেছিলাম আমার খ্যাতি আর বিত্ত সম্পত্তি দিয়ে অনেককে কিনেছি তোমাকে সে ভাবে নিতে চাইনে পেতে চাইনে। তুমি দরিদ্র বলে আমি সে সুযোগ নেবনা। তোমার সঙ্গে আমার যে সম্পর্ক তা যদি শুধু দেহেরই হয় তা শুধু দেহেরই থাকুক। দুজনে একটা দৈহিক আনন্দের অংশীদার। সমান অংশ। কেউ ছোট নয়, কেউ বড় নয়। কেউ দাতা নয়, কেউ প্রার্থিণী নয়। তাই আমি শুধু তোমাকে ফুল উপহার দিয়েছি যার কোন আর্থিক দাম নেই বললেই চলে, যা পরদিন শুকিয়ে যায়। মনে আছে তোমার?'

সুপ্রীতি বলল, 'আছে।'

বিমলেন্দু বলল, 'কিন্তু আমি সেই সঙ্কল্পে সব সময় অটল থাকতে পারিনি। মন আমার মাঝে মাঝে টলে উঠেছে। ছুটে গেছে জুয়েলারের দোকানে ছুটে গেছে ব্যাঙ্কের চেক বইতে। কিন্তু আমি দুহাতে বল্‌গা টেনে সেই ঘোড়াকে ফিরিয়েছি। জীবনে এই একটি

মাত্র প্রতিজ্ঞায় আমি শক্ত হয়েছিলাম। এই একটি ক্ষেত্রে আমি তোমার অমর্যাদা করিনি, আমারও অমর্যাদা হতে দিইনি। উঃ, উঃ।'

হঠাৎ রোগ যন্ত্রণায় চীৎকার করে উঠল বিমলেন্দু।

ডাক্তার আর নার্সরা ব্যস্ত হয়ে ছুটে এল।

কিন্তু সুপ্রীতি তাদের উপস্থিতি উপেক্ষা করে কিংবা লক্ষ্য না করে আবেগের সঙ্গে বলে উঠল, 'শোন শোন আমিও সেই জন্যই আমারও মন টলেছিল—তুমি শুনে যাও তুমি জেনে যাও—।'

কিন্তু রোগীর আর্তনাদে সুপ্রীতির সব কথা ডুবে গেল।

দু'তিনজন প্রবীণ ডাক্তার রোগীর ওপর ঝুঁকে পড়লেন। তাঁদের মধ্যে একজন হঠাৎ সুপ্রীতির দিকে মুখ ফিরিয়ে গম্ভীর স্বরে বললেন, 'আপনি বাইরে যান। আর এখানে থাকবার দরকার নেই।'

সুপ্রীতিকে এগিয়ে নেওয়ার জন্যে একটি নার্স এসে কাছে দাঁড়াল।

সন্ধান

শুনে দুঃখিত এবং স্তম্ভিত হলাম আমার বন্ধু সুধাকর দত্ত দ্বিতীয়বার পাগল হয়ে গেছেন। প্রথমবারের অসুস্থতা বছর দেড়েক ছিল। লুম্বিনী পার্কে রেখে চিকিৎসা করাবার পর বেশ সেরে গেলেন। বছর খানেক ভালোই রইলেন। ফের এই কাণ্ড। ডাক্তাররা কিন্তু খুব ভরসা দিয়েছিলেন। তাঁরা জোর করে বলেছিলেন, 'আপনারা নিশ্চিন্ত থাকুন সুধাকরবাবুর আর কোনো ভয় নেই।'

খবর পেয়ে আমি ওঁদের বেনেপুকুরের বাড়িতে দেখা করতে গেলাম। অবশ্য সঙ্গে সঙ্গেই যেতে পারিনি। নানা কাজকর্মের চাপে তিন চার দিন দেরিই হয়ে গেছে। গিয়ে দেখি সুধাকরবাবুকে তাঁর দাদা আগেই হাসপাতালে পাঠিয়ে দিয়েছেন। এবার নাকি উন্মত্ত হয়ে উঠেছিলেন। মারধর গালাগাল করে সারা বাড়িটাকে একেবারে অস্থির করে তুলে ছিলেন। ভাড়াটে বাড়ি। পাঁচজনের শান্তির ব্যাঘাত হয়। তাই সুধাকরবাবুর দাদা প্রভাকরবাবু আর কালবিলম্ব করেননি।

বাড়িতে গিয়ে দেখি সমস্ত পরিবার মূহ্যমান হয়ে পড়েছে। সুধাকরবাবুর দুটি ভাইপো ভাইঝি মনের আনন্দে বারান্দায় লুকোচুরি খেলছে। ছেলেটির বয়স বছর সাত আট, মেয়েটির বয়স পাঁচ ছয়।

প্রভাকরবাবুকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'হঠাৎ এমন হল কেন!'

একটু বিরক্ত হয়ে বললেন, 'কী করে বলব। কেন এমন হল তাই যদি জানতে পারতাম তাহলে তো একটা কিছু প্রতিকারই করা যেত।'

আমি একটু অপ্রস্তুত হলাম। এমন রূঢ়তা সুধাকরবাবুর দাদার কাছ থেকে আশা করিনি। সুধাকরবাবু আমার বাল্যবন্ধু নন। অফিসের

সহকর্মী। বিয়ে থা করেননি। পড়াশুনো ভালবাসেন। বইপত্র নিয়েই থাকেন। শান্ত নির্বিরোধ মানুষ। আমার মেজাজের সঙ্গে খানিকটা মিল আছে। তাই একধরণের ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল। অফিস থেকে বেরিয়ে আমরা কোনদিন রেষ্টুরেন্টে বসে চা খেয়েছি, কি কার্জন পার্কে বসে গল্প করেছি, কদাচিৎ দু'একবার সিনেমায় গিয়েছি। তিনি কয়েকবার বাড়িতেও ডেকেছেন। বাড়িতে মানে তাঁর ঘরে। একতলায় সারি সারি তিনখানা ঘরের মধ্যে সবচেয়ে শেষের দক্ষিণ দিকের ঘরখানিতে সুধাকরবাবু থাকতেন। সেখানে বসে বসে দুজন গল্প করতাম। সাহিত্য রাজনীতি সমাজনীতি দুজন ভদ্র নাগরিক যে সব প্রসঙ্গ নিয়ে আলাপ আলোচনা করতে পারে আমরা তাব বাইরে যেতাম না। ব্যক্তিগত বন্ধুত্ব। অথচ ব্যক্তিগত জীবনের কথা প্রায় বলতেই চাইতেন না সুধাকরবাবু। তাঁর পরিবারের লোকজনের সঙ্গেও আমি তেমন মেলামেশা করি এটা তাঁব যেন ইচ্ছা ছিল না। তবু কয়েকবার যাতায়াতেব ফলে দেখাসাক্ষাৎ হয়েছে আর সবাইব সঙ্গে আলাপ পরিচয়ও আস্তে আস্তে হয়ে গেছে। সুধাকরবাবুর মা আর দাদা বউদির সঙ্গে আমার প্রায় তেমনি করেই আলাপ হয়েছিল। ঠিক পারিবারিক বন্ধু আমি ওঁদের হতে পারিনি। ওঁদের কাবোরই বোধহয় তেমন আগ্রহ ছিল না। পবিবারের প্রত্যেকেই যেন একটু বেশি মাত্রায় স্বাতন্ত্র্যপ্রিয়। সুধাকরবাবুব দাদা প্রভাকরবাবুও তাই। কলেজের প্রফেসাবি করেন। শুধু গুরু নয় গম্ভীরও। বয়স বছর চল্লিশেক হবে। সুধাকরবাবু তাঁব চেয়ে দু তিন বছবের ছোট। কিন্তু দাদা আর ভাইয়ের মধ্যে বন্ধুত্ব থাকলেও আমার সঙ্গে প্রভাকরবাবুর ঘনিষ্ঠতা হয়নি। তাই তাঁর কথার অসৌজন্যটুকু কানে লাগল।

তাঁর স্ত্রী পঁয়ত্রিশ ছত্রিশ বছরের মহিলা। মোটা বলা যায় না তবে বেশ একটু পুষ্টাঙ্গী। গায়ের রং গৌর। লম্বা কম নন। পাঁচফুট তিন চার ইঞ্চি হবেন। তাই পুষ্টতাটুকু তেমন চোখে পড়ে না। কিন্তু তাঁর হৃষ্টতা আমি লক্ষ্য করেছিলাম। সুধাকরবাবুরা দুই ভাই যেমন

একটু বেশিমাত্রায় গম্ভীর আর বিষণ্ণ প্রভাকরবাবুর স্ত্রী তা নন। এ বাড়ির মধ্যে তিনিই যা একটু সামাজিক। সামান্য কারণেই সশব্দে হাসেন, আলাপ টালাপে আগ্রহও আছে। কিন্তু তিনি যে বাইরের একজন ভদ্রলোকের সঙ্গে বেশি কথাবার্তা বলেন তা তাঁর স্বামী, দেওর কি শাশুড়ী কেউ যেন তেমন পছন্দ করতেন না। বুঝতে পেরে আমিও একটু দূরত্ব রেখে চলতাম। অথচ যাকে রক্ষণশীল বলে পরিবারটি ঠিক তাও নয়। পাঁজিপুঁথি তাবিজকবজের অনুশাসন এঁদের কাউকে মানতে দেখিনি। সামাজিক রীতিনীতি স্ত্রী পুরুষের মেলামেশা সম্বন্ধেও এঁদের মতামতের ঔদার্যই লক্ষ্য করেছি। তবু আমার মনে হয়েছে নিজেদের ব্যক্তিগত জীবন সম্বন্ধে এঁরা একটু বেশি মাত্রায় চাপা। অবশ্য আধুনিক নাগরিক সভ্যতার ধরণই এই। প্রাইভেসিকে আমারা মানসিক আভিজাত্য বলে মনে করি। সহজে নিজের সুখদুঃখ আশাআকাঙ্ক্ষার কথা কাউকে বলিনে, আবার কেউ বলুক তাও চাইনে। আমার মনে হয়েছে সুধাকরবাবুর বউদি অমিতা দেবী পাছে এই নিয়মভঙ্গ করে পারিবারিক আভিজাত্য ক্ষুণ্ণ করেন সেই জন্যেই তাঁর চারদিকে এমন কড়া পাহারা ছিল। অবশ্য পাহারা দেবার খুব যে বেশি দরকার ছিল তা নয়। বাইরের লোকজনকে কদাচিৎ এ বাড়িতে দেখেছি। অমিতা দেবীর ভাই বোন আর বউদিদের মাঝে মাঝে দেখেছি। আর প্রভাকরবাবুর ছাত্রীরাও কেউ কেউ আসে। ইকনমিকসের অধ্যাপক হিসাবে নাম আছে তাঁর। পরীক্ষার সময় কোন কোন ছাত্রী তাঁর কাছে এসে পড়ে যায়। প্রভাকরবাবু মেয়ে কলেজের প্রফেসর। পাড়ার ছাত্রীরাও নানা ব্যাপারে তাঁর সাহায্য নেয়। রাশভারী গম্ভীর প্রকৃতির হলেও সহিষ্ণু আর সহৃদয় বলে প্রভাকরবাবুর খ্যাতি আছে। তাঁর স্বাভাবিক গাম্ভীর্য সেই খ্যাতি প্রতিপত্তি বাড়াতে সাহায্য করেছে।

খবর নেওয়ার জন্যে অফিসের ছুটির পরে বেরিয়েছিলাম। সাড়ে পাঁচটা বাজতে না বাজতেই শীতের সন্ধ্যা নেমেছে। গাছপালা ঘেরা

পুরোন বাড়ি। দিনের বেলাতেও কেমন একটু রহস্যঘন মনে হয়। এই দুর্ঘটনার ছোঁয়ায় অস্বস্তিকর বিষন্নতা যেন আরো বেড়ে গিয়েছিল।

একটুবাদে আমি উঠে দাঁড়ালাম, 'আচ্ছা চলি। আজতো আর হবে না, আমি বরং কাল পরশু গিয়ে সুধাকরবাবুকে দেখে আসব।'

প্রভাকরবাবু হঠাৎ বলে উঠলেন, 'না, আপনি বরং আরো কিছুদিন পরে—আমি আপনাকে ফোনে খবর দেব—তখন দেখা করতে যাবেন। চেনা কাউকে দেখলে আরো গোলমাল করে। দেখাসাক্ষাৎ করতে ডাক্তাররা নিষেধ করে দিয়েছেন।'

আমি আর একবার ঘা খেলাম। অবশ্য প্রভাকরবাবু যা বলেছেন তা খুবই যুক্তিসঙ্গত। ডাক্তাররা যদি নিষেধ করে দিয়ে থাকেন আমিই বা কেন যাব। কিন্তু প্রভাকরবাবুর বলবার ভঙ্গীর মধ্যেই এমন একটা বাধা দেওয়ার, প্রতিরোধ করবার ধরণ ছিল যা অনুভব করতে পেরে আমি অস্বস্তি বোধ করলাম। আমি তো সাধারণ পাঁচজনের মত কৌতূহলী হয়ে আসিনি, ওঁদের বিপদে সহানুভূতি জানাতেই এসেছি। কিন্তু বাইরের কারো সহযোগিতায়, কারো সহানুভূতিতে যেন এঁদের দরকার নেই। এঁরা নিজেদের গণ্ডীর মধ্যে আর কাউকে ঢুকতে দিতে চাননা। যেন কিসের একটা ভয়। পাছে যেটুকু ওঁরা জানতে চান তার চেয়ে বেশি কিছু লোকে জেনে ফেলে।

আমি আনুষ্ঠানিক ভাবে আগেই বিদায় নিয়ে রেখেছি। এবার বেরোবার উদ্যোগ করলাম। কিন্তু প্রভাকরবাবুর স্ত্রী চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়িয়ে আমাকে বাধা দিলেন, 'না না তা কি হয়। অফিস থেকে ফিরেছেন একটু চা টা খেয়ে যান।' আমি দ্বিতীয়বার আপত্তি করলাম। কিন্তু ভদ্রমহিলা করুণভাবে বললেন, 'দেখুন, আমাদের বন্ধুবান্ধব বেশি নেই। তাছাড়া ইদানিং আপনার সঙ্গেই যা একটু মিলত, আর কারো সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ করতে চাইত না।'

এরপর এঁর অনুরোধ এড়ান কঠিন হল। প্রভাকরবাবুও বললেন 'বসুন একটু, আমিও এক্ষুণি বেরোব।'

অমিতা দেবী ভিতরে চলে গেলেন, প্রায় সঙ্গে সঙ্গে পর্দা সরিয়ে এলেন তাঁর শাশুড়ী। বিধবা বৃদ্ধা মহিলা। বয়স সত্তরের কাছাকাছি হবে। পরণে থান ছিপছিপে শীর্ণ চেহারা। মুখখানা ভারি ক্লিষ্ট, ক্লান্ত বলে মনে হয়। নিষ্প্রভ দুটি চোখে আমার দিকে তাকিয়ে একটু কাল চুপ করে রইলেন। তারপর মৃদুস্বরে বললেন, 'আমার আবার সর্বনাশ হয়ে গেছে বাবা।' তাঁর চোখে জল বেরোল না, গলা আর্দ্র হয়ে উঠল না। সব যেন শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে।

আমি তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে বললাম, 'সর্বনাশ কেন বলছেন? আর পাঁচটা অসুখের মত এও একটা অসুখ। চিকিৎসা করলেই সেরে যাবে।'

তিনি বললেন, 'আর সারবে না।'

হঠাৎ প্রভাকরবাবু অসহিষ্ণু হয়ে উঠলেন। বৃদ্ধা মার দিকে ফিরে তাকিয়ে খানিকটা বিরক্তি আর অস্বস্তির ভঙ্গিতে বললেন, 'কী করে জানলে সারবে না? যাও ভিতরে যাও।'

প্রভাকরবাবুর মা উঠে গেলেন না। যেন নিজের মনেই বলতে লাগলেন, 'তখন অত করে বললুম বিয়ে দে। বিয়ে দিলে সব শুধরে যাবে। আমার কথা কেউ শুনল না।'

প্রভাকরবাবু বিরক্ত হয়ে বললেন, 'না তোমরা সবাই মিলে আমাকেও পাগল করে তুলবে। সুধা তো কচি খোকা নয়। ওর বিয়ের জন্যে কে না চেষ্টা করেছে? কথা যদি না শোনে—'

হঠাৎ তাঁর খেয়াল হল আমি বসে আছি। বাইরের লোক হয়ে তাঁদের পারিবারিক আলোচনা শুনে ফেলেছি। এতে তিনি আরও অধীর হয়ে উঠলেন। স্ত্রীর উদ্দেশ্যে হাঁক দিয়ে বললেন, 'কই, তোমাদের চা-টা হল?'

ছেলের ভাবভঙ্গি দেখে মা আর সেখানে বসে থাকতে সাহস পেলেন না। মোড়া ছেড়ে উঠে আস্তে আস্তে বাড়ির ভিতরে চলে গেলেন।

এর পর অমিতা দেবী ট্রেতে করে দুটি চায়ের কাপ টোষ্ট আর ওমলেট নিয়ে এলেন।

আমি কুণ্ঠিত হয়ে বললাম, 'এত কেন করতে গেলেন ?'

তিনি বললেন, 'এত আর কই, খান।'

প্রভাকরবাবু নিজের চায়ের কাপটি তুলে নিয়ে বললেন, 'বিরজা কোথায় ?'

অমিতা দেবী বললেন, 'রান্না করছে।'

'নীলা-দিলু ?'

অমিতা দেবী সংক্ষেপে জবাব দিলেন, 'পড়ছে।'

এবার একটু যেন নিশ্চিন্ত বোধ করলেন প্রভাকরবাবু। চা শেষ করে উঠে দাঁড়ালেন। খাবারটা সেরে আমিও তাড়াতাড়ি উঠে পড়লাম।

অমিতা দেবী বললেন, 'ওকি আপনি বসুননা।'

প্রভাকরবাবু তাঁর স্ত্রীর দিকে তাকালেন, 'ওঁর যদি কাজ থাকে ওঁকে আটকে রেখে লাভ কি।'

অমিতা দেবী তখন বললেন, 'আচ্ছা আর একদিন কিন্তু আসবেন। ভালোকথা, আপনার যে বইগুলি আছে, মানে সুধাকরকে আপনি যে বইগুলি পড়তে দিয়েছিলেন, সেগুলি কি আজ নিয়ে যাবেন ?' একটু থেমে করুণ সুরে বললেন, 'এখনতো আর দরকার নেই।'

আমি একটু ইতস্তত করে বললাম, 'আচ্ছা থাক আর একদিন এসে নেব।'

তিনি বললেন, 'তাই আসবেন।'

প্রভাকরবাবু ভিতরে ভিতরে অস্থির হয়ে উঠেছেন। তাঁর মৃদু পদচারণ দেখেই তা বুঝতে পারলাম, আমি আর দেরি করলাম না। অমিতা দেবীর সঙ্গে নমস্কার বিনিময় করে তাঁর স্বামীর পিছনে পিছনে আমিও বেরিয়ে এলাম।

পথে এসে তিনি বললেন, 'আপান কোন দিকে যাবেন ?'

বললাম 'আমি তেত্রিশ নম্বর ধরব।'

তিনি যেন নিষ্কৃতি পেলেন, 'ও, আমি সার্কুলার রোড থেকে ট্রাম নেবো। কলেজ আছে রাত দশটা অবধি।'

লম্বা লম্বা পা ফেলে তিনি মুহূর্তের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

দুই ভাইয়ের মধ্যে চেহারার সাদৃশ্য আছে। সুধাকরও ওঁর মতই প্রায় ছ'ফুট লম্বা দোহারা গড়ন, ফর্সা রঙ, লম্বাটে ধরণের মুখ। চোখ আর নাকের গড়নে খুঁৎ আছে বলে পুরোপুরি সুপুরুষ মনে না হলেও লাবণ্যটুকু চোখে পড়ে। চিবুকের টোলটুকু ভারি সুন্দর লাগে আমার কাছে। সেই টোল, প্রভাকরবাবুর মুখেও আছে। কিন্তু সে মুখ বন্ধুর মুখ নয়।

আমি আস্তে আস্তে পূব মুখে এগোতে লাগলাম। গোরাচাঁদ রোড দিয়ে, বাঁয়ে চিত্তরঞ্জন মেডিকেল কলেজ রেখে, নিউ সি. আই. টি. রোডের মোড়ে এসে দাঁড়ালাম। এই অঞ্চল দিয়ে সুধাকরবাবুর সঙ্গে অনেক বেড়িয়েছি। বেড়াতে বেড়াতে গল্প করতে তাঁর খুব ভালো লাগে। তবে বাড়ির কাছাকাছি এসব অঞ্চল ছাড়া বেশি দূর তিনি যেতে চাইতেন না। একটু এগিয়ে পার্কের মধ্যে কিছুতেই তাঁকে নিতে পারতাম না। বলতেন, 'ওখানে বড় ভীড়।'

ভ্রমণের গণ্ডীর মত আলাপের সীমাও আমাদের সঙ্কীর্ণই ছিল। কিন্তু তাঁর সঙ্গগুণেই হোক, আর আন্তরিকতার জন্যেই হোক, কোনদিন কোন আলোচনা একঘেয়ে লাগত না। গম্ভীর হলেও তিনি নীরস ছিলেন না তাঁর কথাবার্তার মধ্যে সহজ পরিহাস প্রবণতা লক্ষ্য করা যেত। কথায় কথায় আমি একদিন বলেছিলাম, 'আচ্ছা সুধাকরবাবু, আপনি বিয়ে থা করছেন না কেন?'

তিনি আমার মুখের দিকে তাকিয়ে একটুকাল চেয়ে থেকে হেসে বলেছিলেন, 'ব্যাপার কি? আপনি ঘটকালি শুরু করলেন কবে থেকে? মেয়ের সন্ধান আছে নাকি?'

'মেয়ের অভাব কি?'

তিনি বলেছিলেন, 'মেয়ের অভাব নেই। মনোরমার বড় অভাব।'

'আপনি কি সুন্দরী মেয়ের কথা বলছেন?'

'তাহলে চক্ষুরমা বলতাম।'

আমি হেসে বললাম, 'দেখুন, সুর কানের ভিতর দিয়ে মরমে প্রবেশ করে, কিন্তু রূপের প্রবেশ পথ চোখ। বাইরের চোখ আছে বলেই আমরা মনশ্চক্ষুর কথা তুলতে পারি।'

তিনি বললেন, 'কিন্তু যতই বলুন মন আর চোখ এক নয়। যাকে চোখ দিয়ে ভালোবাসেন তাকে মন দিয়ে ভালো নাও বাসতে পারেন, কিন্তু যাকে মন দিয়ে ভালোবাসেন সে আর যাই হোক চক্ষুশূল হয়না। আমি অবশ্য দৃষ্টিহীন হতে চাইনে। কিন্তু দুই চোখকে যখন প্রশ্রয় দিই তা সহস্রলোচন হয়ে ওঠে।'

সুধাকরবাবুর কথাবার্তা আমি সব সময় বুঝতে পারতাম না। মাঝে মাঝে ওঁকে পিউরিট্যান, মর্যালিষ্ট বলে মনে হত। মাঝে মাঝে আবার উল্টো সুরের কথাও শুনতে পেতাম। আমার মনে হত তিনি কোন বিষয় সম্বন্ধেই কোন সিদ্ধান্তে এসে পৌঁছাতে পারেন নি। পৌঁছাবার দিকে যেন তাঁর তেমন গরজও নেই। উল্টোপাল্টা চিন্তাতেই তাঁর আনন্দ। আনন্দ না আসক্তি? এখন মনে হচ্ছে তিনি সবসময়েই কোন না কোন বিষয় নিয়ে অন্তর্দ্বন্দ্বে ভুগতেন। সামান্য সাধারণ বিষয়েও তাঁর মনস্থির করতে সময় লাগত। বোধহয় মনস্থির তিনি করতেই পারতেন না। শেষপর্যন্ত অস্থির হয়ে ঝোঁকের মাথায় যা হয় কিছু একটা করে বসতেন। আগে লক্ষ্য করিনি, এখন মনে হচ্ছে অস্বাভাবিকতা তাঁর মধ্যে গোড়া থেকেই ছিল।

বিয়ের প্রসঙ্গ নিয়ে তাঁর সঙ্গে আরো দু একবার আলোচনা হয়েছে। ব্যক্তিগত জীবনের কথা কখনো তিনি মুখে বলেননি। তবে একদিন মন্তব্য করেছিলেন, দাম্পত্যজীবনের ওপর তাঁর বিশ্বাস নেই।

আমি তর্ক তুলেছিলাম, 'বিশ্বাস না থাকার কি মানে হয়, সংসার আর সমাজকে যদি স্বীকার করেন, দাম্পত্য-বন্ধনকে না মেনে উপায় থাকেনা।'

তিনি হেসে বলেছিলেন, 'ওই যে বললেন বন্ধন, ওর মধ্যেই আসল

কথাটুকু রয়ে গেছে। দাম্পত্য থাকুক কিন্তু তার অত আঁটসাঁট বিধিনিষেধের বাঁধন যেন না থাকে, একজনকে আর একজনের পুরোপুরি দখলে রাখবার প্রতিযোগিতা যেন না চলে। তাহলে সে বাঁধন দুদিন যেতে না যেতেই গলার ফাঁস হয়ে দেখা দেয়। এই আমার দেখে শেখার অভিজ্ঞতা, জানিনে আপনারা ঠেকে আরো কিছু বেশি শিখেছেন কিনা।'

একটু বাদে ফের বলেছিলেন, 'অবশ্য দাম্পত্য সম্পর্ককে যদি খুব ঢিলে করে দিই তাতেও বোধহয় সম্পর্কের সেই ঘনত্ব আর থাকে না। সেও এক ধরণের সোনার পাথর বাটিই হয়ে দাঁড়ায়।'

তত্ত্ব ছেড়ে মাঝে মাঝে আমি তথ্যের দিকে পা বাড়িয়েছি। নানা কৌশলে জানতে চেষ্টা করেছি কোন মেয়ে তাঁর জীবনে এসেছে কিনা। যদি এসে থাকে তার সঙ্গে ওঁর মিলনে বাধা কোথায়।

কিন্তু সুধাকরবাবু কিছুতেই ধরা ছোঁয়া দেননি। হেসে বলেছেন 'আপনারা গল্প লেখক। কল্পনায় একটি কেন একশত নায়িকারও আমদানি করতে পারেন। কিন্তু একটু যদি ভেবে দেখেন তাহলে বুঝতে পারবেন আমাদের মত লোকের মানসী বস্তুজগতে থাকে না, তাকে মনোজগতেই গড়ে তুলতে হয়, এবং তুলে রাখতে হয়। জল ছাড়া যেমন মীন বাঁচেনা, মন ছাড়া তেমনি মনোরমার অস্তিত্ব নেই।'

আমি ওঁর কথায় সায় দিতাম না। আমার নায়করা রাম শ্যাম যদু মধু; আমার নায়িকারা পুঁটি বুচি খেঁদি পেঁচির দল। আমি জানি তাদের কেউ সর্বাঙ্গসুন্দরী নয়, অনেকেই বরং অসুন্দরী, আমি জানি তাদের কেউই বুদ্ধিতে হৃদয়ে কোনদিন পূর্ণতা পায় না। তা নিয়ে আমার ক্ষোভ নেই। প্রেমই হোক, মত্ততাই হোক তার স্পর্শে অংশই আমাদের পূর্ণতার স্বাদ দেয়। নিরবয়ব মানস সৌন্দর্যকে আমি স্বীকার করিনে। স্থূল খড়-মাটি কাঠ লোহা, প্রীতি প্রেম, ঈর্ষ্যা দ্বেষ রক্তমাংস এসব উপাদান ছাড়া আমি অচল, তবে উপাদানই আমার সব একথাও মানতে রাজী নই।

এই নিয়ে সুধাকরবাবুর সঙ্গে মাঝে মাঝে তর্ক হত। আর সে তর্কের কোন মীমাংসা হত না।

তা সত্ত্বেও সুধাকরবাবুকে আমার ভালো লাগত। আমাকেও তিনি কিছু কিছু পছন্দ করতেন। কিছু কিছু ছাড়া কি। পুরোপুরি পছন্দ আর কে কাকে করতে পারে। মানুষ সবচেয়ে বেশি ভালোবাসে নিজেকে। সেই নিজেরই কি সবখানি সে পছন্দ করে?

তারপর সেই দুর্ঘটনা ঘটল। আমাদের সওদাগরী অফিসের একাউন্টস্ ডিপার্টমেণ্টে কাজ করতেন সুধাকরবাবু। কোন বিভাগেই কাজ করে তাঁর সুখ ছিল না। বদলি হতে হতে তিনি ওখানে গিয়ে ঠেকেছিলেন। যোগ-বিয়োগে তিনি হাজার দশেক টাকার গোলমাল করে ফেললেন। চীফ একাউণ্ট্যাণ্ট চোখ গোল করে বললেন, 'এখন যে জেলে যেতে হবে মশাই। কোম্পানী কি সহজে ছাড়বে?'

সুধাকরবাবু মুখ চুণ করে বললেন, 'তাইতো কি হবে।' আমি সান্ত্বনা দিয়ে বললাম, 'অত ভাবছেন কেন? যারা আপনাকে চেনে তারা কিছুতেই একথা মনে করবেনা টাকাটা আপনি নিজের সিঁন্দুকে তুলেছেন।'

তিনি বললেন, 'কিন্তু আমাকে কজনই বা চেনে?'

বললাম, 'তাহলে তো কোন কথাই নেই। অচেনা লোকে আপনার সম্বন্ধে কী ভাবল না ভাবল তাতে কি এসে যায়।'

তিনি বললেন, 'আপনি বুঝতে পারছেন না ব্যাপারটা অত সহজ নয়। আমাদের চেনা জগৎ অনেকগুণ বড়। আমরা রোজ সে জগতের সঙ্গে মুখোমুখি হইনে। কিন্তু তবু তা আছে।'

সুধাকরবাবু সামাজিক ছিলেন না। কোন বিয়ে শ্রাদ্ধ অন্নপ্রাশন কি কোন সভাসমিতিতে তাঁকে যেতে দেখিনি। তিনি সব সময় ভীড় এড়িয়ে চলতেন। আত্মীয়দের সঙ্গে যোগাযোগ ছিলনা। বন্ধুর সংখ্যা নগণ্য। কিন্তু দেখে অবাক হলাম পাছে সমাজ তাঁকে অবিশ্বাস

করে, ভুল বুঝে মিথ্যা অপবাদ দেয় তা নিয়ে তাঁর আশঙ্কার অন্ত নেই। জেনারেল ম্যানেজার এই নিয়ে যে কোন হৈ চৈ করলেন তা নয়। সুধাকরবাবুকে ডেকে দু চারটে কথা জিজ্ঞাসা করলেন। একটু তিরস্কারও করে থাকবেন ব্যাপারটা যে ভুলের জন্যেই হয়েছে তাতে তিনি কোন সন্দেহ করলেন না। তবে টাকাটা তাড়াতাড়ি পুরিয়ে দিতে বললেন। লিমিটেড কোম্পানীর নানারকম অসুবিধে আছে।

সুধাকরবাবুর দাদা কিছু নিজের কাছ থেকে, কিছু বা ধার করে সংগ্রহ করে দিলেন। শুনেছি তাঁর স্ত্রীর গয়নার বাকসেও হাত পড়েছিল। যা হোক এই নিয়ে মামলা-মোকর্দমাও হলনা, সুধাকরবাবুর চাকরিও গেলনা। অবশ্য আর একবার তাঁকে স্থানান্তরিত হতে হল। কিন্তু সেই যে তাঁর ধারণা হল তিনি সবাইর চোখে হেয় হয়ে গেছেন, তাঁর জন্যে তাঁর দাদা বিড়ম্বিত হয়েছেন, তা কিছুতেই আর তাঁর মন থেকে সরানো গেলনা।

আমি বললাম 'তাতে কি হয়েছে। আপনার নিজেরই তো দাদা। আপনার জন্যে তিনি না হয় কিছু কষ্ট করলেনই।'

সুধাকরবাবু মাথা নেড়ে বললেন, 'উঁহু। অযোগ্যতা এমনই জিনিস তাতে ভালোবাসার বাঁধনেও টান পড়ে। কোন সময়ে ছিঁড়ে যায়। এর চেয়ে আমার জেলে যাওয়াই ভালো ছিল।'

আমি বললাম, 'ছি ওসব কি বলছেন। আপনি ও ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামাবেন না। যা করছিলেন তাই করুন। যেমন পড়াশুনা নিয়ে ছিলেন তেমনি থাকুন।'

কিন্তু বললে কি হবে, ওঁর মনের মধ্যে যে ধারণা ঢুকে গেছে তার অপসারণ আমার পক্ষে সম্ভব হলনা। দেখা হলে ওই এক কথা নিয়েই আলোচনা হত। আমি ইচ্ছা করেই তাঁর সঙ্গে এড়িয়ে চলতে লাগলাম।

মাস কয়েকের মধ্যেই অদ্ভুত সব অভ্যাস সুধাকরবাবুর মধ্যে লক্ষ্য করা গেল। এর আগে সহকর্মীদের সঙ্গে তিনি মিশতেন না। কারো

সঙ্গে কথা বলতেন না, কে কী নিয়ে আলোচনা করে সেদিকে কান দেবার তাঁর কোন গরজ ছিল না, প্রবৃত্তিও ছিল না। কিন্তু এই ঘটনার পর তিনি সমস্ত পৃথিবী সম্বন্ধে যেন হঠাৎ সচেতন হয়ে উঠলেন। দুজন লোক একসঙ্গে কথা বললে তিনি তাঁদের দিকে তাকিয়ে থাকেন। কখনো বা পা টিপে টিপে তাঁদের পিছনে গিয়ে দাঁড়ান। প্রত্যেকেই বিরক্ত হয়। এ কী গোয়েন্দাগিরি এ কী অসভ্যতা। সকলেরই ব্যক্তিগত জীবন আছে। যার যার নিজের সমস্যা আছে। প্রত্যেকেই নিজের নিজের সুখ দু খের কথা সঙ্গোপনে বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে আলোচনা করতে চায়। অন্য কেউ যদি সে আলাপ উৎকর্ণ হয়ে শোনে কি পিছনে গিয়ে উঁকি ঝুঁকি দেয় লোকের তাতে বিরক্ত হবারই কথা। একাউন্টসের পরেশ সরকার এমনি বিরক্ত হয়েই একদিন বলেছিলেন, 'অমন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কি শুনছেন মশাই। আপনার কথা আলোচনা হচ্ছেনা। আমাদের আরো কাজ আছে। নিশ্চয়ই আপনি কিছু একটা ঘটিয়েছিলেন। নইলে আপনার অত ভয় কিসের? Guilty mind এর ধরণই ওই।'

সঙ্গে সঙ্গে এক অসম্ভব কাণ্ড ঘটে গিয়েছিল। তেড়ে উঠে সুধাকরবাবু ঘুষি মেরেছিলেন পরেশবাবুর মাথায়।

সারা অফিসে হুলুস্থুল পড়ে গেল। সুধাকরবাবু পরেশবাবুর মাথা ফাটিয়ে দিয়েছেন। আমার তো শুনে প্রথমটা বিশ্বাসই হয়না। সুধাকরবাবু কারো গায়ে হাত দিতে পারেন তাঁর সঙ্গে যে দীর্ঘদিন ধরে মিলেছে তার পক্ষে একথা সত্যি মানতে পারা শক্ত।

সবাই ধরাধরি করে দুজনকে আলাদা করে ছাড়িয়ে দিল। সুধাকরবাবু রুদ্ধ আক্রোশে বললেন, 'আমাকে চোর বলল।'

পরেশবাবু বিদ্রূপ করে বললেন, 'চোরকে চোর বলব না সাধু বলব?'

সুধাকরবাবু বললেন, 'আমি তোমার নামে ডিফেমেসন স্যুট আনব। শূয়োর কোথাকার।'

জেনারেল ম্যানেজার দুজনকেই সাসপেণ্ড করতে চেয়েছিলেন।

আমরা ধরাধরি করায় সুধাকরবাবুর বিনা মাইনের তিন মাস ছুটি মঞ্জুর হল। পরেশবাবু ক্ষমাটমা চেয়ে আগের মতই কাজ করতে লাগলেন।

সেই থেকেই সুধাকরবাবুর মস্তিষ্ক বিকৃতি শুরু। দিন কয়েক বাদে আমি একদিন দেখা করতে গেলে তিনি দুঃখ করে বললেন, 'সত্যি আমি বড় লজ্জিত। আমি যে অমন একটা পশুর মত ব্যবহার করতে পারি—।'

আমি বললাম, 'মানুষের মেজাজ কোন কোন সময় খারাপ হতে পারে। তাতেই তাকে পশু বলা যায় না।'

তিনি চুপ করে রইলেন।

আমি বললাম, 'আপনি বরং কিছুদিন বাইরে থেকে ঘুরে আসুন। শরীরটাও সারবে।'

তিনি প্রতিবাদ করে উঠলেন, 'শরীরের আমার কিছুই হয়নি। আমি বেশ আছি।'

তাঁর মা আর দাদা বউদিও তাঁকে বাইরে নেওয়ার জন্যে চেষ্টা করছিলেন। কিন্তু তিনি কিছুতেই ঘর ছেড়ে নড়বেন না। তার গোঁ কেউ ভাঙতে পারলেন না। তিনি আমার সঙ্গেও দেখা সাক্ষাৎ বন্ধ করে দিলেন। ঘর থেকে কিছুতেই বেরোবেন না। আমি একদিন জোর করে তার ঘরের সামনে গিয়ে দাঁড়াতে তিনি বিরক্ত হয়ে সশব্দে দরজা বন্ধ করে দিলেন।

তারপরে যা হবার হল ছুটি ফুরোবার আগেই তিনি উন্মাদ হয়ে গেলেন। নাওয়া খাওয়া নিয়ে প্রথম থেকেই খামখেয়ালীপনা করতেন। এখন একেবারেই আয়ত্ত্বের বাইরে চলে গেলেন। একদিন গিয়ে শুনলাম ঘরের বহু জিনিষপত্র ভেঙে চুরে নষ্ট করে ফেলেছেন, আলমারির বইপত্রও নাকি আর কিছু আস্ত রাখেননি। শুনে দুঃখ হল। বেশ ভালো কলেকসন ছিল।

প্রথম রাঁচী পাঠাবার কথা শুনেছিলাম। তারপর লুম্বিনী পার্কেই প্রভাকরবাবু চিকিৎসার ব্যবস্থা করে ফেললেন। ভাবলাম ভালোই

হল। কাছাকাছি আছেন। মাঝে মাঝে অন্তত দেখা সাক্ষাৎ করা যাবে।

কিন্তু আমি দু একদিনের বেশি যেতে পারিনি। প্রথম দিনেই তিনি আমাকে খানিকটা চিনতে পারলেন বলে মনে হল। অদ্ভুত ধরণের হাসি হেসে বললেন, 'এই যে আসুন ভিতরে আসুন।'

আমি বললাম, 'চিনতে পারছেন ?'

তিনি উদ্‌ভ্রান্তের মত আমার দিকে তাকালেন। বললেন, 'চিনব না কেন। আমার কাউকে চিনতে বাকি নেই। আমি সবাইকে চিনি, সবাইকে চিনি।'

হঠাৎ হেসে উঠলেন সুধাকরবাবু।

মনে মনে ভাবলাম জ্ঞানীরা পাগল হয়েও জ্ঞানগর্ভ কথা ছাড়া বলেন না। আবার সাধারণের কাছে অনেক তত্ত্বজ্ঞ আর জ্ঞানীরাও পাগল হিসেবেই পরিচিত থাকেন। কিন্তু আমি তো সুধাকরবাবুকে তেমন করে চেনার কথা জিজ্ঞাসা করিনি, পরিচিত বন্ধু হিসেবে চিনেছেন কিনা তাই জানতে চেয়েছিলাম। সে প্রশ্নের সদুত্তর পেলাম না। চিকিৎসার ধারা সম্বন্ধে ডাক্তারের সঙ্গে দু তিন মিনিট আলাপ হল, কিন্তু তিনিও দেখলাম বেশি কথা বলতে অনিচ্ছুক।

এরপর অফিসের সহকর্মীদের মধ্যে নানারকম আলোচনা শুনেছিলাম। সুধাকরবাবু নাকি একাই পাগল হননি। এ রোগ ওঁদের বংশগত। ওঁর বাবাও নাকি পাগল হয়ে মারা যান। সুধাকর বাবুর মাও এ রোগের হাত থেকে নিষ্কৃতি পাননি। আর একজন বললেন, ওর দাদাই বা কি ? তিনিও দুবার আত্মহত্যা করতে চেষ্টা করেছিলেন।

দেখলাম শুধু আমি নয় অফিসের আরও কেউ কেউ ওঁদের পরিবারকে চেনেন। নানাসূত্রে নানা ধরণের খবর আসতে লাগল। তবে এসব সংবাদের কতখানি সত্য কতখানি জল্পনা আমি আর তা যাচাই করে দেখিনি। কিন্তু আশ্চর্য সুধাকরবাবুর রোগটা যত

তাড়াতাড়ি বেড়ে গিয়েছিল, তেমনি অল্পদিনের মধ্যে সেরেও গেল। বোধ হয় ছ' মাসও তাঁকে হাসপাতালে থাকতে হয়নি। তার আগেই ছাড়া পেলেন।

আমি অবশ্য সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর বাড়িতে গিয়ে হাজির হইনি। তাঁর দাদাকে ফোন করে খোঁজখবর নিয়ে ডাক্তারেরা দেখা করবার অনুমতি দিয়েছেন কিনা তা জেনে সুধাকরবাবুর কাছে গিয়েছিলাম।

কোণের সেই ছোট ঘরখানিতে ইজিচেয়ারে চুপ করে বসেছিলেন সুধাকরবাবু। আমাকে দেখে উঠে দাঁড়ালেন একটু হেসে বললেন, 'আসুন আসুন।'

আমি তাঁর সামনের চেয়ারটায় বসে বললাম, 'ওকি আপনি দাঁড়িয়ে রইলেন কেন? বসুন।'

তিনি বললেন, 'বসেই তো থাকি।'

কিছুক্ষণ চুপচাপ রইল।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, 'শরীর কেমন আছে আপনার?'

তিনি বললেন, 'ভালো।'

সামনের বাড়িগুলির দিকে তাকিয়ে আবার যেন খানিকক্ষণ অন্যমনস্ক হয়ে রইলেন। যেন কোন অতল গভীরে ডুব দিয়েছেন। মাঝে মাঝে অন্যমনা হবার অভ্যাস ওঁর নতুন নয়, গোড়া থেকেই ছিল। আমি দেখলাম অসুখের পর শরীরটা ওঁর রোগা হয়ে গেছে। দেহ মনের ওপর দিয়ে প্রচণ্ড একটা ঝড় যে চলে গেছে তা বোঝা যায় না। ঝড়ের পরের এখনকার অবস্থাটা বড় শান্ত। বেশ চোখে পড়ে।

ঘরের আসবাবপত্রেরও অনেক অদলবদল হয়েছে দেখা গেল। সেই বইয়ের আলমারিগুলি আর নেই। তবে দেওয়ালের দিকে ঠেস দেওয়া টেবিলটা রয়েছে। তার ওপর সুন্দর একটি ফুলতোলা টেবিল ক্লথ। বোধ হয় ওঁর বউদির হাতের কাজ। অল্প কিছু বই পত্র। কালো রঙের একখানা বড় ডায়েরি। তার পাশে কম দামি একটি ফাউন্টেন পেন আর একটি রঙিন পেনসিল।

জানলার ধারে তক্তপোষ। তাতে পরিচ্ছন্ন বিছানা। টিপয়ের ওপর ছোট একটি ফুলদানি। তাতে ছুটি শ্বেত পদ্ম। পাপড়িগুলি এখনো খোলেনি। চমৎকার সাজানো গুছানো ঘর। সুস্থ মানুষেরই বাসগৃহ। তবু আমার মনে হল যেন একটি হাসপাতালের চেম্বারে বসে আছি। সবই আছে। কিন্তু সেই সঙ্গে প্রাণচাঞ্চল্যের যেন অভাব।

একটু বাদে আমি জিজ্ঞাসা করলাম, 'কাগজ কলম রয়েছে দেখছি। লেখেন নাকি কিছু কিছু?'

সুধাকরবাবু আমার দিকে তাকিয়ে অসহায়ের ভঙ্গি করলেন বললেন, 'ইচ্ছে হয় লিখতে। আর কিছু না পারি নিজের কথা বলতে তো বাধা নেই। নিজেকে নিয়ে একখানা উপন্যাস সবাই লিখতে পারে। কিন্তু তাও পেরে উঠিনে। কেমন যেন সব গোলমাল হয়ে যায়।'

আমি বললাম 'ও নিয়ে ভাববেন না। সময় সময় ওরকম হয়।'

সুধাকরবাবু বললেন, 'কিন্তু আমার যেন মনে হচ্ছে আমি সব ভুলে গেছি। ফের একেবারে ক খ থেকে শুরু করতে হবে। একেবারে নতুন শৈশব। এক হিসেবে মন্দ নয়, বুড়ো হওয়ার আগেই মরে যেতে পারব।'

তিনি সব ভুলে গেছেন একথা আমার যেন বিশ্বাস হতে চাইছিল না। যিনি এখনো এমন সুন্দর করে কথা বলতে পারেন তিনি সম্পূর্ণ স্মৃতিভ্রষ্ট হয়েছেন এ কথা মানি কী করে। হয়তো এও তাঁর এক ধরণের ধারণা। স্মৃতিভ্রংশ হয়েছেন একথা এই মুহূর্তে তাঁর ভাবতে ভালো লাগছে। অবশ্য কথা বলবার ধরণের মধ্যে কিছু যে বৈষম্য ছিল না তা নয়। কেমন যেন থেমে থেমে আস্তে আস্তে কথা বলছিলেন সুধাকরবাবু। যেন তিনি ঠিক আমার সামনে বসে নেই। অনেক দূরে চলে গেছেন। কিম্বা এমন অনেক কথা তাঁর মনে আসছে যা তিনি মুখে বলতে চাইছেন না অন্য অনেক কথা দিয়ে চাপা দিতে চাইছেন।

এমন ঘনিষ্ঠ বন্ধুর কাছে বসেও খুব যেন স্বস্তি বোধ করছিলাম না। মনে হচ্ছিল যেন উঠতে পারলে বাঁচি এই সময় সুধাকরবাবুর বউদি এসে রক্ষা করলেন। আমার জন্যে চা আর তাঁর দেওরের জন্যে দুধের গ্লাস নিয়ে তিনি ঘরে ঢুকলেন। হেসে বললেন, 'লক্ষ্মী ছেলের মত এইটুকু খেয়ে নাও তো।'

সুধাকরবাবু বললেন, 'আমার চা কই।'

'উঁহু চা নয়। এখন দুধ খাবে। বেশি চা খেলে রাত্রে তোমার ঘুম হতে চায় না। তা কি ভালো ?'

নিজের ইচ্ছায় বাধা পড়ায় মনে হল সুধাকরবাবু ভয়ঙ্কর অসন্তুষ্ট হয়েছেন। এখনই যেন উঠে দাঁড়াবেন, কি কিছু একটা কাণ্ড কারখানা করে বসবেন। কিন্তু লক্ষ্য করলাম শেষপর্যন্ত প্রাণপণে সেই রাগকে চেপে রাখলেন। দুধের গ্লাসটা অমিতাদেবীর হাত থেকে নিয়ে এক পাশে রেখে দিয়ে বললেন, 'পরে খাব। আচ্ছা বউদি আমার বইয়ের আলমারিগুলি সব সরিয়ে নিয়ে গেলে কেন ? একটাও কি রাখতে নেই ?'

অমিতাদেবী হেসে বললেন, 'একটাও কি আস্ত আছে যে রাখব ?' বলেই তিনি যেন অপ্রতিভ হয়ে গেলেন। একথা বলা তাঁর ইচ্ছা ছিল না তা বুঝতে পারলাম। একটু বাদে তিনি সব সামলে নিয়ে হেসে তরল কণ্ঠে বললেন, 'গেছে তো বালাই গেছে। ঢের পড়েছ আর পড়তে হবে না, এবার হাতে কলমে কাজকর্ম কর।'

কিন্তু সুধাকরবাবু ওকথায় ভুললেন না। কাতর ভঙ্গিতে বললেন, 'ভেঙে চুরে সব বুঝি নষ্ট করেছি ? আর কি কি গেছে বলতো বউদি ?'

অমিতাদেবী হেসে বললেন, 'আর আবার কি যাবে ? বইগুলি গেছে ভালোই হয়েছে। ওগুলি ছিল আমাদের শত্রু। বইয়ে মুখ দিয়ে পড়ে থাকতে আর কারো দিকে ফিরেও তাকাতে না।'

আমি লক্ষ্য করলাম পানের রসে অমিতাদেবীর ঠোঁট দুটি লাল।

কথা বলবার ভঙ্গিতেও সহজ সরলতা আর কৌতুক আছে। এ বাড়িতে এই বধূটিকেই আনন্দের ঝরণা বলা যায়। আর সব অচল পাহাড়।

শাশুড়ীর ডাক শুনে অমিতাদেবী একটু বাদে মোড়াটা ছেড়ে উঠে গেলেন।

সুধাকরবাবু সেদিকে তাকিয়ে রইলেন একটুকাল। তারপর চোখ ফিরিয়ে নিয়ে দেয়ালগুল্পির দিকে তাকিয়ে বললেন, 'দেখেছেন একখানা ছবি কি ফটোও নেই। সব ভেঙে তছনছ করে দিয়েছি। অনেক কষ্টকরে অনেকদিন ধরে বইগুলি সংগ্রহ করেছিলাম সব গেছে।'

হঠাৎ তাঁব তুটি চোখই ছলছল করে উঠল। আমি একটু চুপ করে থেকে বললাম, 'অত ভাবছেন কেন। আবার হবে আবার করবেন।'

তাঁর দীর্ঘশ্বাস শুনতে পেলাম।

একটুবাদে তিনি ফেব কথা বললেন, 'জানিনে আরো কত নষ্ট করেছি আর কার কি ক্ষতি করেছি। কিন্তু আমাকে জানতে হবে। আমি সারা জীবন দিয়ে সব শোধ করে যাব। আমি কারো কাছে ঋণী থাকব না, আলবৎ নয়।'

চেয়ারের হাতলে চাপড় দিলেন সুধাকরবাবু। তাঁর চোখ মুখের ভঙ্গি কেমন যেন একধরণের অস্বাভাবিক হয়ে উঠল। আমি আতঙ্কে কাঠ হয়ে গেলাম। সুধাকরবাবু আবাব ক্ষেপে গেলেন না তো?

আমবা সুস্থ মানুষ উন্মাদকে ভয় করি। সে আমাদের অনাত্মীয়, অপরিচিত শত্রুর মত। ছেলেবেলায় আমার প্রতিবেশী একটি পাগলকে দেখেছিলাম। তিনিও খুব বিদ্বান, স্কুল কলেজের সেরা ছাত্র ছিলেন হঠাৎ মাথা খারাপ হয়ে যায় তারপর একদিন শিকল ভেঙে বেরিয়ে দশ বার বছরের একটি ছেলেকে ঝাঁটা দিয়ে পিটিয়ে প্রায় শেষ করে ফেলেছিলেন অনেক লোকজন জড় হয়ে তাঁকে বেঁধে ফেলে।

পাগলকে আমার দারুণ ভয়। শুধু আমি কেন কে না ভয় করে? যে উন্মাদ হিংস্র নয় তার সঙ্গেও একঘণ্টা কাটাতে আমার সাহস হয়-না। অথচ এই উন্মাদ আমাদের নিজের মধ্যেই আছে। কখনো

কামে কখনো ক্রোধে কখনো হিংসায় আমরা সুস্থতার সীমা ডিঙিয়ে যাই, জ্ঞান হারাই বোধ হারাই। তবু আংশিক উন্মাদযুক্ত উন্মাদের পুরো উন্মাদকে ভয়ের সীমা নেই।

আস্তে আস্তে সুধাকরবাবু শান্ত হলেন। তাঁকে শ্রান্তও দেখাতে লাগল।

এক ফাঁকে তাঁর কাছ থেকে বিদায় নিলাম।

তিনি দোর পর্যন্ত এগিয়ে দিতে দিতে বললেন, 'আমায় দু একখানা বই চাইলে দেবেন তো! ভয় নেই আর ছিঁড়ব না।'

হেসে বললাম, 'না না ছিঁড়বেন কেন।'

তারপর আরো কয়েকদিন এসেছি। একদিন দেখি তিনি ছোট ভাইঝিকে নিয়ে বাড়ির ধারের ফাঁকা জায়গা টুকুতে বেড়াচ্ছেন। ভারি ভালো লাগল।

সুধাকরবাবু হাসলেন, 'দেখেছেন? নীলি দিলু কেউ আর আমাকে ভয় করে না। ওদের সাহস বেড়ে গেছে। তারচেয়ে বেশি সাহস ওদের বাবা মার। সত্যি ভারি ভালো লাগে। আমার কাছেও ছেলেমেয়েরা আসে। আমার সঙ্গেও লোকে কথা বলে। To start life anew.'

বললাম, 'তা বলবেনা কেন? অসুখ বিসুখ কি আর মানুষের হয় না? তারপর ফের সুস্থ হলে সে কথা আর কে মনে করে রাখে!'

তিনি বললেন, 'সুস্থতা কি জিনিস যে একবার তা না হারায় সে কোনদিন তা বুঝতে পারে না।'

আমি বললাম, 'ও বস্তু আমরা পদে পদে হারাই। কিংবা হারিয়েই রয়েছি। পুরোপুরি সুস্থ আমাদের মধ্যে কজন?'

ভাইঝিকে বিদায় দিয়ে সুধাকরবাবু আমার আরো কাছে এলেন। ফিস ফিস করে বললেন, 'আচ্ছা, আপনি কি নিজের হাতে নিজের কোন জিনিস নষ্ট করেছেন।'

আমি হেসে বললাম, 'করেছি বইকি ?'

তিনি আগ্রহে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কী বলুন তো ?'

আমি গম্ভীরভাবে বললাম, 'জীবন।'

সুধাকরবাবু একটুকাল চুপ করে থেকে বললেন, 'এসব আপনার কাল্পনিক দুঃখবিলাস। আপনি কিছু নষ্ট করেননি কিন্তু আমি করেছি। আমি আমার সুনাম সংযম সব হারিয়েছি।'

আমি একটু কৌতুকের সঙ্গে বললাম, 'কি রকম ?'

তিনি বললেন, 'ওই অবস্থায় আমি নাকি সব অশ্রাব্য কুশ্রাব্য কথা বলেছি, শুধু তাই নয় আমি নাকি—' তিনি আমার কানের কাছে মুখ এনে বললেন, 'আমি নাকি কোন একটি মেয়েকে জড়িয়ে ধরে চুমু খেয়েছি। ছি ছি ছি।'

লজ্জিতভাবে মুখখানা একটু ফিরিয়ে রাখলেন সুধাকরবাবু। তাঁর ভাব দেখে আমি হেসে বললাম, 'বেশ করেছেন।'

তিনি বিরক্ত হয়ে বললেন, 'আপনি বলছেন, খুব মজা পাচ্ছেন না। কিন্তু ভেবে দেখুন তো একজন ভদ্রলোকের--। ছি ছি ছি।'

আমি বললাম, 'আপনি তো আর তখন সুস্থ ছিলেন না। ইচ্ছা করে তো ওসব করেননি।'

তিনি বললেন, 'তা কেন করব ? ব্যাপারটা আমার মনে নেই। কে সে মেয়ে, কখন ঘটল এ কাণ্ড সব ভুলে গেছি।'

বললাম, 'আপনি শুনলেন কার কাছে ?'

তিনি বললেন, 'শুনেছি। ছি ছি ছি আমি ভাবতে পারিনে—।'

তারপর আরো যে কদিন দেখা সাক্ষাৎ হয়েছে কোন না কোন ভাবে এই প্রসঙ্গ সুধাকরবাবু টেনে এনেছেন। কোনদিন বলেছেন, 'দেখুন যদি মেয়েটির নামধাম জানতে পারতাম আমি তার কাছে গিয়ে ক্ষমা চেয়ে আসতাম। সে হয়তো লজ্জায় আমার সামনে আর আসতেই পারে না।'

আমি বললাম, 'ওসব ভাবনা ছেড়ে দিন। ও অবস্থায় লোক

কত কাণ্ডই না করে। বিশেষ করে যখন আপনার কিছু মনে নেই।'

সুধাকরবাবু লজ্জিত মধুর ভঙ্গিতে হাসলেন, 'না, না এখন একটু একটু মনে পড়ছে। খুব আবছা আবছা। মুখখানা ভারি সুন্দর, ভারি সুন্দর। চোখ দুটি কালো আর বড় বড়। আর সেই চোখভরা গভীর মমতা আর সহানুভূতি। যার বিন্দুতে সিন্ধুর স্বাদ বুঝেছেন। দাদার ছাত্রীদের মধ্যে কি কেউ—ছি ছি ছি আমি ভাবতেই পারিনে।'

একটুকাল চুপ করে রইলেন সুধাকরবাবু। তারপর মৃদুস্বরে বললেন, 'লক্ষ্য করেছেন, দাদা আজকাল আর তাঁর কোন ক্লাস বাড়িতে নেন না। তাঁর ছাত্রীদের আসা যাওয়া খুব কম। লক্ষ্য কবেছেন ব্যাপারটা? হয়তো আমার জন্যেই—। ছি ছি ছি।'

আমি বললাম, 'না না, তা কেন হবে। হয়তো আপনার কোন পুরোনো বান্ধবী অসুখের খবব পেয়ে এসেছিলেন।'

সুধাকরবাবু খুসি হয়ে বললেন, 'ঠিক ঠিক। কিন্তু কে? কে সে হতে পারে?'

অসহায়ভাবে স্মৃতিব তলদেশ যেন হাতড়ে বেড়াতে লাগলেন সুধাকরবাবু সে কে? সে কে?

মাথার ঘন চুলের মধ্যে আঙুল বুলাতে লাগলেন খানিকক্ষণ। তারপর বললেন, 'যেই হোক ভারি রূপবতী, শুধু রূপ নয়, লাবণ্যে ভরা। লাবণ্যে ভরা মুখ মমতায় ভরা বুক। আমি অমন আর দেখিনি। হয়তো আমি তার কাছে কোন অপরাধ করিনি।'

আমি বললাম, 'না না, অপরাধ করবেন কেন? আপনি ওসব চিন্তা একেবারে ছেড়ে দিন।'

কিন্তু আমি যতই অন্য প্রসঙ্গ তুলি সুধাকরবাবু যেন কিছুতেই স্বস্তি পাননা। খানিকক্ষণ বাদে বাদে আবার ওই কথায় ফিরে আসেন।

'জানেন তার স্পর্শ আমি যেন এখনো অনুভব করতে পারি। অদ্ভুত অদ্ভুত। তার তুলনা নেই। পৃথিবীর সমস্ত জ্ঞান, সমস্ত কাব্য সমস্ত ধনরত্ন উজাড় করে দিলেও তার তুলনা হবেনা। পৃথিবীতে

স্পর্শসুখের তুলনা নেই ! এ শুধু দেহের সঙ্গে দেহের নয়, সত্তার সঙ্গে সত্তার স্পর্শ। এর বিন্দুতে সিন্ধুর স্বাদ।'

সুধাকরবাবুর চোখমুখ এক অদমনীয় বাসনার আভায় প্রদীপ্ত হয়ে ওঠে। যেন আগুনের আঁচ লেগেছে।

আমি চুপ করে থাকি। এ অবস্থায় ওঁকে বাধা দিয়ে লাভ নেই, বরং সব বলতে দেওয়া ভালো।

সুধাকরবাবু বলতে থাকেন, 'অথচ ওই প্রথম। বিশ্বাস করুন জীবনে আমি কোনদিন আর কাউকে ঠিক অমন করে--। সেই প্রথম। সেই প্রথমা। প্রথমা আর পরমতমা। কিন্তু আশ্চর্য আমি তার নাম মনে আনতে পারছিনে। মুখখানা চোখের সামনে আসতে আসতে মিশিয়ে যায়। কে হতে পারে ? আশ্চর্য।'

আমি বললাম, 'আপনি বরং কোন সাইকোলজিস্টের কাছে যান। তিনি হয়তো আপনাকে সাহায্য করতে পারবেন।'

তিনি বিরক্ত হয়ে উঠলেন, 'খবরদার খবরদার ওদের নামও আমার কাছে করবেন না। ওরা ত্বনিয়ায় ডাক্তারি ছাড়া কিছু জানে না। কাব্য বলুন সাহিত্য বলুন সবই ওদের কাছে রোগের বীজাণুতে ভরা। মনের ডাক্তারে আমার দরকার নেই। তার চেয়ে মনের মানুষ অনেক ভালো।'

প্রতিবাদ করে লাভ নেই, তাতে তিনি আরো উত্তেজিত হবেন। বরং সুধাকরবাবুর কথায় সায় দিয়ে চললে ওঁকে শান্ত রাখা যায়।

তারপর আমি মাস দেড়েক ওঁর আর কোন খোঁজখবর নিতে পারিনি। নিজের কাজকর্ম নিয়ে ব্যস্ত ছিলাম। লেখার ব্যাপারে বাইরের তাগিদের সঙ্গে অন্তরেব তাগিদ মেলানো সহজ নয়। অথচ সে চেষ্টা আমাদের অনবরতই করতে হয়।

কিন্তু এ কী ! আমি ঘুরে ফিরে ফের সুধাকরবাবুদের বাড়ির

কাছেই এসে পড়েছি। বাস ষ্টপে দাঁড়িয়ে পায়ে ব্যথা ধরে গিয়েছিল। তারপর বাস যখন এলো উপচে পড়া যাত্রীদের দেখে ঢুকবার আর সাহস হলনা। দ্বিতীয় রথ কখন আসবে ঠিক নেই। নিজের মনে আস্তে আস্তে পায়চারি করছিলাম। ঘুরে ঘুরে একেবারে সুধাকর বাবুদের বাড়ির কাছে হাজির। আমার গাটা শির শির করে উঠল।

ধারে কাছে আলো নেই, শব্দ নেই। গলির প্রান্তে পুরো বাড়িটা আবছা অন্ধকারে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। উন্মাদাগারই বটে। কিন্তু নিজের মনের সেই অস্বস্তিকর ভাবটুকু জোর করে কাটিয়ে উঠলাম। ভাবলাম এসেই যখন পড়েছি অমিতাদেবীর কাছ থেকে বইগুলি চেয়েই নিয়ে যাই। সুধাকরবাবুর বারবার অনুরোধে ডস্টয়েভস্কির সেটটা তাঁকে ধার দিতে হয়েছিল। বইগুলি সত্যিই এখানে ফেলে রেখে আর লাভ নেই।

কড়া নাড়তেই সামনের ঘরে আলো জ্বলল। অমিতাদেবীই এসে দোর খুললেন। প্রথমে একটু অবাক হলেন। দ্বিতীয়বার আমাকে নিশ্চয়ই প্রত্যাশা করেননি। হাসবার চেষ্টা করে বললেন, 'আসুন। কী ব্যাপার।'

আমি লজ্জিত হয়ে কৈফিয়তের ভঙ্গিতে বললাম, 'ইয়ে, মানে ভাবলাম্ বইগুলি নিয়ে যাই।'

অমিতাদেবী বললেন, 'সেই ভালো।'

দোরটা ভেজিয়ে দিলেন তিনি। তারপর একটু হেসে বললেন, আপনি তো চা ভালোবাসেন। আর এক কাপ—।'

আমি ব্যস্ত হয়ে বললাম, 'না না না আর চা নয়। আপনি বরং বইগুলি—। সুধাকরবাবু তাগিদে অতিষ্ট হয়েই ওসব বই ওঁকে দিয়েছিলাম, নইলে দেওয়ার আমার মোটেই ইচ্ছা ছিল না।'

অমিতাদেবী বললেন, 'বইতে কোন ক্ষতি হয়নি। ইদানিং কোন বইয়ের পাতাই উল্টে দেখবার তার ক্ষমতা ছিল না। আমি অনেক আগেই ওগুলি সরিয়ে রেখেছিলাম।'

বললাম, 'ভালোই করেছিলেন। ইদানীং কি করতেন সুধাকরবাবু ?'

তিনি বললেন, 'খেয়ালীপনার কি কিছু ঠিক ছিল ? হিজিবিজি লিখত, নিজের মনে মনে বক বক করত।'

আমি একটুকাল চুপ করে রইলাম। তারপর বললাম, 'কিন্তু ফের এমন হঠাৎ উদ্দাম—।'

অমিতাদেবী একটু চোখ নামিয়ে নিলেন। মৃদুস্বরে বললেন, 'আপনি তো জানেন সব। উদ্দামতা ওর মনে সব সময়েই ছিল। প্রাণপণে চেপে রাখতে চেষ্টা করত। সেদিন সারাদিন কিছু খেলনা। রাতটাও উপোসে কাটাবার মতলব। আমি অনেক কাকুতি মিনতি করে দোর খোলালাম। কিন্তু আমাকে ঘরে ঢুকতে দেখে সে আরো ক্ষেপে গেল। বাঘের মত তেড়ে এল একেবারে।'

আমি বললাম 'তাবপর ?'

তিনি বললেন 'আমি কিছুতেই সরে যেতে পারলাম না। ছু হাত দিয়ে আমার ছুই কাঁধ ততক্ষণে সে চেপে ধরেছে। বল সে কে ? বলতেই হবে তোমাকে। আমি যত বলি ঠাকুরপো ছাড়ো ছাড়ো, সে কেউ নয়, কেউ নয়। আমি তোমাকে ঠাট্টা করেছিলাম। কিন্তু পাগল কি আর সে কথা শোনে ?'

অমিতাদেবী থামলেন।

হঠাৎ আমার মুখ থেকে বেরিয়ে গেল, 'আপনি কি সত্যিই ঠাট্টা করেছিলেন ?'

অমিতাদেবী আমার মুখের দিকে তাকালেন। ছুচোখের কোণে জল টল টল করছে। একি শোক না অনুশোচনা ?

তিনি আস্তে আস্তে বললেন 'হ্যাঁ।'

ছুজনে ফের একমুহূর্ত চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলাম। তারপর তিনি বললেন, 'যাই বইগুলি নিয়ে আসি।'

প্রিয়তম

নামটি যে চমৎকার তা মনে মনে নিশ্চয়ই অনেকেই স্বীকার করে। সুধীর দোকানে বসে লক্ষ্য করেছে যারা সামনের ফুটপাত দিয়ে হেঁটে যায় তাদের কারো যদি সাইনবোর্ডখানা চোখে পড়ে সে একটু না একটু মুখ মুচকে হাসবেই। বিশেষ করে সে যদি মেয়ে হয়, সুন্দরী হয়, কুমারী আর অল্পবয়সী হয়, তার মুখখানা লজ্জায় একেবারে টুকটুক করে। তারপর সেই রাঙা মুখখানা নিয়ে দোকানের একেবারে ভিতরে এসে ঢোকে। সঙ্গে আর কোন পুরুষ কি মেয়ে বন্ধু থাকলে ভালোই, না থাকলে একাও আসে। এসে হয়তো নতুন ডিজাইনের ভ্যানিটি ব্যাগটায় হাত দেয়, কি কাঁচের যে ছোট্ট আলমারিটাব মধ্যে কাঠের ওপর নকসা-কাটা গয়নার বাক্সগুলি রয়েছে সেখানে গিয়ে মুগ্ধচোখে দাঁড়িয়ে থাকে। মেয়েটির গায়ে গয়না নেই, বাক্সের মধ্যে গয়না নেই, কিন্তু হবে হবে, দুজনেরই হবে, দুজনেই একদিন ভরে উঠবে।

মুগ্ধ হয়ে দেখবার মতো আরো অনেক জিনিস আছে ওই আলমারির তাকগুলিতে। আছে নানা আকারের নানা ধরনের কৌটো, গোল আর চ্যাপ্টা। কোনটা মোষের শিং দিয়ে তৈরি, কোনটা হাতীর দাঁতের। সুধীর মনে মনে ভাবে, কেবল মরা মানুষের দেহের কোন জিনিসই কোন কাজে লাগে না। তার সব গর্ব শুধু তাজা দেহ নিয়ে। মরে গেলে হয় ছাই, না হলে মাটি।

মনোহরণের আরো অনেক বস্তু আছে দোকানে। আছে বেতের চেয়ার, চামড়ায় মোড়া বাঁশের মোড়া। আছে কাঠের ক্যালেণ্ডার, টেবিলের ওপর বই সাজিয়ে রাখবার জন্যে নকসা-কাটা শেলফ। আছে নানা আকারের ফুলদানি, কৃষ্ণনগরের ছোট ছোট পুতুল।

যুগলমূর্তি হর আর পার্বতীর। আসলে এই মর-পৃথিবীরই নর আর নারী। কারিগর কোন দৈবীভাব আনতে পারেনি এই দুই মূর্তিতে, চেষ্টাও করেনি। করলে, বিয়ের বাজারে চলত না। আজকাল বুড়ো শিবকে কোন্ পার্বতী পছন্দ করে ? তাই শিবের চেহারাও করতে হয় কার্তিকের মতো, মদনের মতো ; যাকে তিনি ভস্ম করেছিলেন। কায়ে মনে তাকেই জয়ী করতে হয়, অমর করতে হয়, শিবের সঙ্গে তাকে মিশিয়ে রাখতে হয়। চারটাকা-পাঁচটাকা দামের এই মাটির যুগল-মূর্তিগুলি বেশ বিক্রি হয় আজকাল। কোনটি আলিঙ্গনবদ্ধ, কোনটি একেবারে চুম্বন-উদ্যত। যার যেমন পছন্দ, সে তাই নেয়।

তারপর আছে দোলনা। বিয়ের দু-তিন বছর পরে যার দরকার হবে সেই ব্যবস্থা সুধীর দাসরা আগেই করে রেখেছে। এগুলিও বেশ বিক্রি হয়। দু-তিনটি ছেলেপুলের হাত ধরে প্রৌঢ় দম্পতিও আসে, নতুন যে আসতে চাচ্ছে কি এসেছে তার ব্যবস্থা করবার জন্যে। আবার একেবারে যারা প্রথম বাপ-মা হচ্ছে তারাও এসে দাঁড়ায়। খদ্দেরকে জিনিসপত্র বিক্রি করবার ফাঁকে ফাঁকে সুধীর আড়চোখে চেয়ে চেয়ে দেখে। স্বামী ফিসফিস করে কি এক একটা কথা বলে আর তরুণী গর্ভিণী স্ত্রীর মুখ লজ্জায় একেবারে লাল হয়ে ওঠে। দেখতে ভারি ভালো লাগে সুধীরের। খদ্দেরের দেওয়া রেজগিগুলি গুণে গুণে নিতে ভুল হয়ে যায়।

দেখতে পেলে সুধীরের দাদা অধীর কড়া ধমক লাগায়, 'কি হাবার মতো তাকাচ্ছিস। খুচরোগুলি ভালো করে গুণে নে।'

সুধীর লজ্জিত হয়ে ফের নিজের কাজে মন দেয়। টাকা-পয়সা বুঝে নেয়, কাগজ দিয়ে প্যাক করে, সুতো দিয়ে জড়ায়, মোটা হলে কাঁচি কি ছুরি দিয়ে কাটে, সরু হলে, তাড়াতাড়ি থাকলে দাঁতেই ছিঁড়ে নেয়। তাজা মানুষের অঙ্গের সব প্রত্যঙ্গই কাজে লাগে।

দোকানটা জ্যেঠতুতো ভাই অধীর দাসের। সুধীর রক্তের সম্পর্কে ভাই, কাজের সম্পর্কে কর্মচারী। মাল ডেলিভারি নেওয়া থেকে শুরু

করে, জিনিসপত্র বিক্রি করা, খদ্দেরদের আপ্যায়ন করা, অবসরমতো তশীল তাগিদে বের হওয়া, আবার ভিতরে এসে দোকানপাট সাজানো-গুছানো ঝাড়পোছ করা, সন্ধ্যার সময় ধূপধুনো দেওয়া—সবই এক হাতে করতে হয় সুধীরকে। অবশ্য অধীরও বসে থাকে না। সে ক্যাশে গিয়ে বসে। হিসাবের খাতাপত্র ঠিক রাখে। কোন্ জিনিস কোত্থেকে কিনলে সস্তায় পড়বে, কোন্ জিনিসের দাম কত বললে খদ্দের চটবেনা, পড়তাও ঠিক থাকবে সে ভাবনা অধীরের। মূলধন জোগাবার ভারও তার। চিন্তা-ভাবনার কাজ, মাথার কাজ সব অধীরের। আর সংসারে মাথার দামই তো সবচেয়ে বেশি।

সুধীরের কাজ হাত-পায়ের, চোখ-মুখের। যে চোখ মেয়েদের দিকে লুকিয়ে লুকিয়ে তাকায়, সেই চোখেই আবার খদ্দেরের জন্য অপলক হয়ে থাকে। সেই চোখ দিয়েই বুঝতে হয় কোন্ বয়সের কোন্ অবস্থার খদ্দেরের মনে কোন্ জিনিসটা ধরবে। আগে নয়নহরণ, তারপরে তো মনোহরণ। সুধীরের যে মুখ তরুণী মেয়েদের সঙ্গে দুটো কথা বলবার জন্যে চুলবুল করতে থাকে সেই মুখই আবার এই দোকানের জিনিসগুলির প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে ওঠে। কাশীপুরের কারিগরের কাজকে কাশ্মীরী কাজ বলে চালায়, সাধারণ কাঠ থেকে মুখের কথায় চন্দনের গন্ধ বার করে। যা দোষ তাই গুণ করতে গিয়ে দোষগুলিও গুণ-বাচকবিশেষ্য, নিজের ত্রুটির সমর্থনে একদিন ক্লাসে এ কথা বলে ধমক খেয়েছিল সুধীর। যত ফাজিলই হোক, বাংলা আর সংস্কৃতে সে-ই সব চেয়ে সেরা নম্বর পেত!

কিন্তু সে বিদ্যা কোন কাজে আসেনি। মাথা খাটাবার কোন দরকারই এ দোকানে তার হয় না। তার কাজ হাত-পায়ের কাজ।

কিন্তু মাথার কাজও একফোঁটা আছে। কেউ জানুক আর না জানুক, কেউ বলুক আর না বলুক আছে। গয়নার কৌটোর ঢাকনির ওপরে পাতায় ঢাকা ফুলটির মতো সেই সূক্ষ্ম কাজটুকু আছে দোকানের এই নামটির মধ্যে। 'প্রিয়তম' নামটি সুধীরেরই রাখা।

শহরের এই বড় রাস্তার ওপরে ঘরখানি ভাড়া নিয়ে দোকানের কি নাম রাখা যায় অধীর দু-চারদিন তা নিয়ে বেশ ভেবেছিল। দুর্গা কালী লক্ষ্মী সরস্বতীরা মাথায় থাকুন, কিন্তু দোকানের মাথার সাইনবোর্ডে তাঁদের নাম আর দেওয়া যায় না। বড় পুরোন হয়ে গেছে ওসব নাম। তারপর দেশ স্বাধীন হওয়ার পর থেকে স্বরাজ স্বাধীনতা কথাগুলির যেন ধার কমে গেছে।

পছন্দমতো নাম আর মেলে না। সংসারে এত কথা এত শব্দ এত নাম, কিন্তু কোনোটাই পছন্দ হয় না।

প্রকৃতিতে যত কোমলতা আছে—ফুল লতা পাতা, নদী এমনকি ধানেরও কত সুন্দর সুন্দর নাম আছে—বাংলাদেশের ধান আর নদীগুলির নামই বোধহয় সব চেয়ে বেশি মিষ্টি—অন্ন আর জল—যে নামগুলি মনে এসেছিল, সুধীর একটা একটা করে সবই তার দাদাকে শুনিয়েছে। কিন্তু অধীরের পছন্দ হয়নি। সে বলেছে, 'দূর! দোকানটাকে তুই কি জলে ভাসিয়ে দিতে চাস, না মাঠে ঠেলে ফেলতে চাস? যা ফেলে এসেছি তা আর নয়। শহরে যখন এসেছি শহুরে হতে হবে। শহুরে নাম বল।'

নাগরিকদের মধ্যে যারা সবচেয়ে জনপ্রিয়, লক্ষ্মীর প্রসাদও যারা সবচেয়ে বেশি পেয়ে থাকে সেই দু-একজন সিনেমা-স্টারের নাম করেছিল সুধীর।

অধীর সঙ্গে সঙ্গে জিভ কেটে বলেছিল, 'তোর বউদি টের পেলে একেবারে খেয়ে ফেলবে।'

সুধীর বলেছিল, 'তাহলে বউদির নামটাই রাখ। সুচারু কথাটা তো ভালোই।'

অধীর ধমক দিয়ে উঠেছিল, 'ফাজলামো হচ্ছে? মা বেঁচে আছেন না? দোকানের ওই নাম দিলে তিনি আমাকে কি চোখে দেখবেন? একেই তো দিনরাত খোঁটা শুনতে হয় আমি নাকি বউয়ের কথায় উঠি-বসি।'

তাহলে কি নাম দেওয়া যায়। আবার ভাবতে বসেছিল সুধীর। নাম-সমস্যা নিয়ে বেশ মাথা ঘামাতে হয়েছিল। প্রিয়, প্রিয়া, সুপ্রিয় সুপ্রিয়া করতে করতে হঠাৎ নামটা মুখ থেকে বেরিয়ে এল 'প্রিয়তম'। কথাটা ঠিক মুখের নয়, মন থেকেই বেরিয়েছে, যে মন মাথার মধ্যে লুকিয়ে থাকে। নাকি কোথায় থাকে কে জানে!

সুধীর জোর দিয়ে বলেছিল, 'এই নামটাই রাখ দাদা। এই নামই সবচেয়ে ভালো হবে।'

অধীরের তবু খুঁৎখুঁতি যায় না। বলেছিল, মেয়েদের নাম দিলে ভালো হত না? ওর সঙ্গে একটা আকার যোগ করে—'

সুধীর বলেছিল, 'না। "প্রিয়তম"ই ভালো। আসলে আমাদের এই মনোহারী দোকানে কিনতে কাটতে মেয়েরাই তো বেশি আসবে। সঙ্গে পুরুষ ছেলে যদি কেউ থাকেও, পছন্দ করবে মেয়েরা, নেড়েচেড়ে দেখবে মেয়েরা, স্বামী কি সঙ্গীকে জিনিসগুলি কিনতে বাধ্য করবে মেয়েরা। তাই নামটা তাদের দিকে চোখ রেখেই রাখা ভালো, দাদা। প্রিয়তম-ই ভালো।'

নামটা শেষ পর্যন্ত অধীরের মনঃপূত হয়েছিল। হেসে বলেছিল, 'কথাটা মন্দ বলিসনি। তোর বুদ্ধি আছে।'

হাসিটা অধীরের ঠোঁটে দুর্লভ। পয়সা যেমন বাক্স থেকে সে অতিকষ্টে বের করে, হাসিটাকে তার চেয়েও দুষ্প্রাপ্য করে রাখে। যেন হাতবাক্সের নয়, একেবারে আয়রন-চেস্টের সামগ্রী। তাই প্রাণের সিন্দুক খুলে নিজের মন থেকে যখন হাসে অধীর, তখন বড় ভালো দেখায়, বড় ভালো লাগে।

এই নামকরণের ইতিহাস সেখানেই শেষ। তারপর এই দোকান-প্রতিষ্ঠার দুবছরের মধ্যে কেউ আর জিজ্ঞাসা করেনি সে কথা। সাইনবোর্ডে নামটা দেখে অনেকেই মুচকি হেসেছে, খদ্দেরদের কেউ কেউ মুখ ফুটে বলেওছে, 'নামটা তো বেশ ভালো দিয়েছেন মশাই।' ব্যস, ওই পর্যন্ত। অধীর পাশে থেকেও কথাটা অযাচিত ভাবে বলেনি যে,

নামটা সুধীরেরই দেওয়া। কেউ জিজ্ঞাসা না করলে সুধীরই বা কী করে কথাটা ফের তোলে।

কিন্তু গত দুবছরের মধ্যে সে সুযোগ আর আসেনি। কেউ আর তোলেনি প্রসঙ্গটা।

তৃতীয় বছরের শুরুতেই একজন করল। সুধীরের কি ভাগ্য সে পুরুষ নয়, মেয়ে। হাতে একখানা বই আর একখানা খাতা দেখে অনুমান করেছে সুধীর, মেয়েটি কলেজে পড়ে। তরুণী সুন্দরী মেয়ে। যাদের বুক ফাটে তো মুখ ফোটে না তাদেরই একজন। কিন্তু সে মুখ যখন ফোটে তখন পদ্মফুলের মতোই ফোটে। তাকে দেখলে পণ্ডিতমশাইএর সেই উপমা 'ফুল্লনলিনী'র কথাই মনে পড়ত সুধীরের। সংস্কৃত পড়াটা কাজে লাগত। নভেল নাটক কবিতার বই পড়া সার্থক মনে হত।

সেই ফুল্লনলিনীই একদিন জিজ্ঞাসা করে বসল। আকাশ মেঘে ছাওয়া। দুপুরের ঠিক পরে। কিন্তু আকাশ দেখে বুঝবার জো ছিল না তখন কোন্ প্রহর। দোকানে ঠিক সেই মুহূর্তে আর একটিও খদ্দের ছিল না। দুপুরে বাসায় খেতে গিয়েছিল অধীর। খাওয়ার পরে একটু গড়িয়ে নিতে গিয়ে স্ত্রীর সেবায় সোহাগে হয়তো ঘুমিয়ে পড়েছিল। তাই সে সময় দোকানে আর কেউ ছিল না। না মালিক না খদ্দের। শুধু সুধীর আর সেই মেয়েটি। মালী আর একটি ফুল।

মেয়েটি ঘরে ঢুকেই সুধীরের কাছে এল না। কাঁচের আলমারির সামনে দাঁড়িয়ে সেই নকসা-কাটা বাক্স কৌটো আর ব্যাগগুলি তাকিয়ে তাকিয়ে খানিকক্ষণ দেখল। আর ফাঁকে ফাঁকে সুধীরের চোখ এড়িয়ে তাকাতে লাগল বাইরের পথের দিকে। সুধীর বুঝেছে। মেয়েটি দোকানে ঢুকবার সঙ্গে সঙ্গেই সে সব বুঝেছে। এই দুপুরবেলায় কলেজ থেকে পালিয়ে মেয়েটি যে কোন জিনিস কিনতে আসেনি, দোকানের জিনিসগুলি যতই নয়নলোভন হোক, সেগুলির কোনটির আকর্ষণেই যে ও এখানে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করেনি, সুধীর এত বোকা

নয় যে তা বুঝতে পারবে না। বয়স তো আর কম হয়নি তার। তিরিশ পেরিয়ে গেল। এই বয়স অবধি বিয়ে-থা না হলেও বরযাত্রী অনেক বার গেছে, প্রেমে না পড়লেও প্রেমের গল্প ঢের পড়েছে। সুধীর বুঝতে পারবে না কেন। তাছাড়া প্রায় ছ'মাস ধরে মেয়েটি আর ছেলেটি এই দোকানে একসঙ্গে আসছে। মাঝে মাঝে শুধু নেড়েচেড়ে চলে যাচ্ছে। একবার মেয়েটি একটি কলমদানি কিনল। সুধীর কি বুঝতে পারল না কার জন্যে? ছেলেটি কিনল সুন্দর একটি সাদা কৌটো আর লাল রঙের ব্যাগ। সুধীরের কি কিছু বুঝতে বাকি রইল এমনি চলছে ছ'মাস ধরে। আরো কত আগে থেকে কে জানে! সুধীর লক্ষ্য করেছে সবদিন ওরা একসঙ্গে আসে না। কেউ আগে আসে, কেউ পরে। সেদিন মেয়েটি আগে এসে পড়েছিল।

মেয়েটি আর একবার তার ছোট হাতঘড়িটির দিকে তাকাল, আরো একবার পথের দিকে। তারপর আস্তে আস্তে চলে এল সুধীরের কাউন্টারের কাছে। ওভাবে দশ মিনিটের বেশি যে দাঁড়িয়ে থাকা যায়না সেই বোধটুকু তাহলে এতক্ষণে জেগেছে।

মেয়েটি কাউন্টারের কাছে এসে আলাপ শুরু করে দিল, 'আচ্ছা, ওই হরপার্বতীর মূর্তি, ওগুলি কোত্থেকে আসে?'

সুধীর বলল, 'কৃষ্ণনগর।'

'মূর্তিগুলি বেশ সুন্দর।'

সুধীর মৃদু হেসে চুপ করে রইল।

'দাম কত?'

সুধীর বলল, 'দাম তো একরকমের নয়। সাইজও একরকমের নয়। ছোট আছে, বড় আছে। কোন্‌টা আপনার পছন্দ আপনি কোন্‌টার কথা জিজ্ঞাসা করছেন—'

ব'লে সুধীর দু'তিনটি মূর্তি এনে তার সামনে রাখল। একটু অপ্রস্তুত হয়েছে মেয়েটি। তাড়াতাড়ি বলল, 'আমি ঠিক আজই কিনছি না।'

সুধীর যেন তা জানে না। 'হেসে বলল, নাই বা কিনলেন। দেখুন না।'

মেয়েটি হাসল, 'যা দেখি তাই ভাল লাগে। যত দেখি ততই ভালো লাগে। পছন্দ আমার সবই। কিন্তু এদের ভিতর থেকে একটি বেছে নিয়ে কিনব। আমার এক বন্ধুর বিয়ে আসছে। তখন কিনব। তখন থাকবে তো?'

সুধীর বলল, 'নিশ্চয়ই থাকবে।'

মেয়েটি মধুর অভিমানের ভঙ্গিতে বলল, 'কই আর থাকে। আপনি শুধু মুখেই বলেন। সেদিন ছুটি ফ্লাওয়ার-ভাস পছন্দ করে গেলাম, ছুদিন পরে এসে দেখি আর নেই।'

সুধীর স্মিতমুখে বলল, 'আপনি একটু বলে যাবেন তাহলেই থাকবে। ছু'মাস পরে এসেও পাবেন।'

মেয়েটি বলল, 'তা জানি। আপনাদের ব্যবহার এত ভালো। এমন ভদ্র ব্যবহার আর কারো কাছে আমরা পাইনি। এ পাড়ায় আরো তো কত দোকান আছে, রেঁস্তোরা আছে, কিন্তু এ দোকানের মতো কোনটাই নয়। আপনারা যখনই দোকানটা খুললেন আমি তখনই বুঝতে পেরেছিলাম এতদিনে সত্যিই একটা সৌখীন দোকান এ পাড়ায় হল। একসঙ্গে এত রকমের শখের জিনিস এ পাড়ায় আর কোথাও নেই। সবচেয়ে চমৎকার আর অরিজিন্যাল হল দোকানের নামটি।' মেয়েটি ফিক ক'রে একটু হাসল, 'আচ্ছা, নামটা কে রেখেছে বলুন তো?'

সুধীর বলল, 'অনুমান করুন।'

মেয়েটি হেসে বলল, 'আপনিই তো! আমি অনেক আগেই বুঝতে পেরেছি। দেখুন আমার আন্দাজ কত ঠিক। এই নিয়ে আমি একজনের সঙ্গে বাজি রেখেছিলাম। ছুজনের মধ্যে যিনি দেখতে ভালো, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, চমৎকার ব্যবহার করেন, চমৎকার কথা বলেন, নামটা নিশ্চয়ই তিনি দিয়েছেন। বাজিতে আমি আজ জিতে গেলাম।'

সুধীর কি বুঝতে পারেনা ? কার সঙ্গে বাজি, কার সঙ্গে এই হার-জিতের মধুর লড়াই ? বুঝতে পারেনা কোন্ যুদ্ধে জয়ও যা, পরাজয়ও তাই ?

কিন্তু বুঝতে পারলেও বলতে নেই। শুধু যেটুকু কানে আসে সেইটুকুই শুনে যেতে হয়। যেটুকু চোখে পড়ে সেটুকু দেখে যাওয়াই ভালো। তার বেশি জানতে গেলে ঠকতে হয়। ঠেকে ঠেকে এ অভিজ্ঞতা সুধীরের যথেষ্ট হয়েছে।

তবু মেয়েটি যে তাদের দু'ভাইয়ের মধ্যে তাকেই বেশি পছন্দ করেছে, দোকানের মালিকের চেয়ে সেলসম্যানই যে তার বেশি নজরে পড়েছে এইটুকু জানতে পেরেই সুধীর খুশি। আর দোকানের নামটা যে এখানে সুধীর ছাড়া আর কেউ দিতে পারে না, তার সম্বন্ধে মেয়েটির এই ধারণাতেই তার মনে আর আনন্দ ধরে না।

তারপর একটু বাদেই ছেলেটি এসে পড়েছিল। শুধু মেয়েটিরই কানে পৌঁছায় গলার স্বরকে ততখানি নামিয়ে বলেছিল, 'sorry'.

মেয়েটি সঙ্গে সঙ্গেই তার দুঃখে দুঃখিত হয়নি। রাগ করে বলেছিল, 'এত দেরি করলে কেন ? তোমার যদি কোন কাণ্ডজ্ঞান থাকে !'

ছেলেটি চোখের ইসারায় তাকে সঙ্গে সঙ্গে থামিয়ে দিয়েছিল। সুধীর যে উপস্থিত আছে এ খেয়াল কি মেয়েটির নেই ?

বুঝতে পেরে একটু অপ্রস্তুত হয়েছিল মেয়েটি, লজ্জিত হয়েছিল।

ছেলেটি হঠাৎ সিগারেটের প্যাকেট বের করে একটা সিগারেট সুধীরের দিকে বাড়িয়ে ধরে বলেছিল, 'নিন।'

সুধীর বলেছিল, 'না না, সে-কি !'

ছেলেটি বলেছিল, 'আহা, নিন না। তারপর কিরকম ব্যবসা-বাণিজ্য চলছে আপনাদের ?'

সুধীর বলেছিল, 'এই চলছে এক রকম।'

ছেলেটি বলেছিল, 'আরো ভালো চলবে। এই দু-তিন বছরের

মধ্যেই বেশ জেঁকে উঠেছেন আপনারা। দেখেও ভালো লাগে। Wish you good luck'.

ছেলেটি বেশ লম্বা। আর বেশ স্মার্ট। সাহেবি পোশাকে ভালোই মানিয়েছে। বয়স পঁচিশ থেকে ত্রিশের মধ্যে হবে। ঠিক যে কত বোঝা যায় না। তবে মেয়েটির চেয়ে বয়সে বেশ বড়! আর দেখে মনে হয় চালাক-চতুরও বেশি। কী করে ওদের আলাপ হল জানবার জো নেই। কতদিনের আলাপ কতদিনের ঘনিষ্ঠতা হয়েছে তাও শুধু অনুমান করেই নিতে হয়। ছেলেটি বোধহয় কোন অফিসে-টফিসে কাজ করে। এমন অফিস যেখান থেকে ইচ্ছা করলে ভর দুপুরেও পালানো যায়, কিংবা এমন অফিস বাইরে বাইরে ঘুরে বেড়ানোই যেখানকার কাজ। হয়তো কোন ইনসিওরেন্স কোম্পানীর এজেন্ট, হয়তো কোন ওষুধের কারখানার এজেন্ট। এমন আরো কত আছে সুধীর তার কী-ই বা খবর রাখে।

কিন্তু যাই হোক, ছেলেটিকে সুধীরের তেমন ভালো লাগেনি। এর মধ্যে হিংসার কিছু নেই। হিংসা সে কেন করতে যাবে, করে লাভটা কি। হিংসা নয়, তার মনে হয়েছে ছেলেটি যেন আরো কমবয়সী আর বেশি রূপবান হলে ভালো হত, মানাতো। কথাবার্তায় আরো একটু ভদ্র, লাজনম্র আর বিনয়ী।

ওর এই সিগারেট অফার করবার ধরণটা সুধীরের ভালো লাগেনি। অবশ্য গোল্ডফ্লেক তার ভাগ্যে কমই জোটে। কিন্তু এত দামী সিগারেট খেয়েও সুধীরের সুখ নেই। ছেলেটির দেওয়ার ধরণটির মধ্যে কোথায় যেন অনুকম্পার ভাব মেশানো আছে। আছে যেন একটু ঘুষ দেওয়ার ধরণ। জিনিসপত্র না কিনেও মেয়েটি যে দোকানে এতক্ষণ অপেক্ষা করেছে, দামী স্বাদু সিগারেট কি সেই জন্যেই?

কিন্তু সুধীর কি এই সিগারেটটার অপেক্ষায় ছিল। সে কি ওর চেয়েও বেশি কিছু পায়নি?

তারপর এই ব্যবসা-বাণিজ্য আর জেঁকে বসার কথাগুলি। যে

প্রেমে পড়েছে, যার সঙ্গে প্রণয়িনী উপস্থিত আছে তার মুখের ভাষা অত কাঠখোট্টা হলে যেন ভালো লাগে না। সুধীর নিজে যদিও দোকানদার, সারাদিন বেচাকেনার কথাই বলে, তবু ছেলেটির মুখ থেকে ওই ধরণের কথাবার্তা শোনবার জন্য সে তৈরি ছিল না। ছেলেটি যেন এই কথাই তাকে বুঝিয়ে দিয়ে গেল : তুমি ব্যবসায়ী ছাড়া আর কিছু নও, তুমি শুধু দোকানদার।

বেচাকেনার ফাঁকে ফাঁকে সুধীর আরো অনেক সময় ভেবেছে মেয়েটি যোগ্যতর আর কাউকে পছন্দ করলে পারত। কিন্তু কে জানে ছেলেটি হয়তো সত্যিই খুব গুণবান, বিদ্বান, চাকরি ক'রে অনেক টাকা রোজগার করে। তা যদি নাও হয় তাতেই বা ওদের প্রেমে পড়তে বাধা কি। এর চেয়ে বেমানান জোড় কি সুধীর দেখেনি? কত দেখেছে। এ তো ঘটকালি নয় যে, ঠিকুজি কুষ্ঠী মিলিয়ে দাঁড়িপাল্লায় সোনাদানার মতো রূপগুণের ওজন নিয়ে বাটখাবাব দুদিক সমান রেখে তবে মিল হবে। এ মিল আর এক রকমেব। এতে তিলপ্রমাণ মিল থাকলেই যথেষ্ট।

বিয়ের মরশুমে দোকানে বেশ ভীড় হয়। বিক্রি হয় জিনিসপত্র। ফুলদানি, গয়নার বাক্স, কৌটো, যুগলমূর্তি সবই চলে। অধীর টেবিল-ঢাকনি, জানালার রঙ-বেরঙের পর্দাও স্টক করতে শুরু কবেছে। বিয়ে আর অন্নপ্রাশনের মরশুম ছাড়াও সেগুলি বিক্রি হয় বেশ। মেয়েটি সব দিন যে তার বন্ধুকে নিয়ে আসে তা নয়, মাঝে মাঝে দু'একজন বান্ধবীকেও আনে। সবাই মিলে শখের জিনিসগুলি দেখে, নাড়ে চাড়ে দর দাম করে। আবার দু'একটা কেনেও। দলের মধ্যে মেয়েটিকে আরো বেশি সুন্দরী দেখা যায়। ছেলেটি সঙ্গে না থাকলে সুধীর তার সঙ্গে স্বস্তিতে আরো সহজভাবে কথাবার্তা বলতে পারে। অন্য পাঁচজনের কাছে যে জিনিস যে দামে বিক্রি করে তার চেয়ে মেয়েটির কাছ থেকে কিংবা তার সঙ্গে যারা

আসে অনেক সময় তাদের কাছ থেকেও দু'আনা এক-আনা কম নেয় সুধীর। তার এই দেওয়ার কথা মেয়েটি জানে না, জানবার উপায়ও নেই।

কিন্তু যে জানবার সে জানে। অধীর মাঝে মাঝে টের পায়। আর টের পেলেই ধমক দেয়। বলে, 'অত যে কমে দিলি, পড়তা ঠিক থাকবে ?'

সুধীর বলে, 'থাকবে দাদা। ওঁরা তো অনেক জিনিস নিয়ে থাকেন। একটু সস্তা করে দিলে আরো বেশি আসবেন, আরো বেশি নেবেন।'

অধীর বলে, 'থাক থাক, বুঝতে পেরেছি। তোকে নিয়ে হয়েছে মহা জ্বালা। মেয়েরা দোকানে এলে আমাকেই কাউণ্টারে বসতে হবে দেখছি। নইলে তুই সব বিলিয়ে দিয়ে আমাকে ফতুর করে দিবি।'

সব ! বড়জোর দু'আনা এক-আনাই তো ছাড়ে সুধীর। ষোল-আনা সে দেবে কোত্থেকে আর নেবেই বা কে ?

তারপর এই আষাঢ় মাসে আর একটা বিয়ের মরশুম এল। অনেক জিনিসপত্র বিক্রি হচ্ছে দোকানে। রোজই কাস্টমারের ভীড় বাড়ছে। অধীর আর সুধীর দুজনেই খুব খুশি। সেদিন অধীর মাল কিনতে বেরিয়েছে, সুধীর এক হাতে বিক্রি করে কুলিয়ে উঠতে পারছে না। হঠাৎ মুখ তুলে দেখে সেই ভীড়ের মধ্যে মেয়েটিও আছে। খুব হাসিখুশি মুখ। শরীরটা আরো ভালো হয়েছে।

সুধীর বলল, 'কদিন তো আসেননি এদিকে ! ভালো আছেন ?'

মেয়েটি বলল, 'হ্যাঁ। দেখুন এবার আমার সেই পছন্দ করা জিনিসগুলি নেব। সব আছে তো ?'

সুধীর বলল, 'সবই আছে। কী ব্যাপার ? আপনার সেই বন্ধুর বিয়ে বুঝি ?'

মেয়েটি হাসি-মুখখানা একটু নামিয়ে নিল। সুধীরের বুঝতে

বাকি রইল না, কার বিয়ে, কার সঙ্গে বিয়ে। আর সঙ্গে সঙ্গে একটি ঈর্ষার কাঁটা বুকে গিয়ে বিঁধল।

কিন্তু সুধীর একমুখ হাসির মধ্যে সেই যন্ত্রণার বিন্দুকে লুকিয়ে ফেলল। বলল, 'ভালোই তো, ভালোই তো। আমরা নিমন্ত্রণ পাব না?'

মেয়েটি বলল, 'পাবেন বইকি। আমার দাদার সঙ্গে চিঠি পাঠিয়ে দেব। জিনিসগুলিও তিনিই এসে নেবেন। আপনি যাবেন কিন্তু।'

সুধীর বলল, 'নিশ্চয়ই যাব।'

ফ্লাওয়ার-ভাস, ভ্যানিটি-ব্যাগ, যুগলমূর্তি, আরও কয়েকটি জিনিস মেয়েটি পছন্দ করে গেল। না করলেও পারত। সুধীর কী জানেনা ওর কি কি পছন্দ? এত দিনেও কি জানতে বাকী আছে? সুধীর ভাবল এর মধ্যে একটা জিনিসের দাম সে নেবে না, সে নিজে দেবে।

কিন্তু পরদিন আর মেয়েটির দাদার দেখা নেই। তার পরদিনও না। বেছে বেছে জিনিসগুলি একদিকে লুকিয়ে রেখেছিল সুধীর; আর বুঝি পারে না। কই তার দাদা? নিজের দাদার ধমকে সুধীর অস্থির হতে লাগল, তারপর আস্তে আস্তে বিক্রি করে দিল জিনিসগুলি। কি আর করবে! তার নিজের জিনিস তো নয়। হয়তো মেয়েটির দাদা অন্য কোন দোকানে গেছেন।। হয়তো এই দোকান থেকেই তিনি তাঁর নিজের পছন্দমতো বিয়ের উপহারের জিনিসগুলি নিয়ে গেছেন। সুধীর কী করে চিনবে। মেয়েটির দাদাকে তো কোনদিন দেখেনি।

কিন্তু মাস ঘুরে গেল, কারোরই দেখা নেই। ছেলেটিও আসে না, মেয়েটিও আসে না। না একসঙ্গে, না আলাদা আলাদা। হয়তো অন্য কোথাও চলে গেছে। অন্য কোন শহরে, কি এই শহরেই অন্য কোন পাড়ায়।

তারপর মেয়েটির বান্ধবী এল একদিন একটা ফুলদানি কিনতে। দোকানে তেমন ভীড় নেই। সুধীর ফুলদানিটা প্যাক করে তার

হাতে তুলে দিতে দিতে বলল, 'দেখুন, কিছু যদি মনে না করেন একটা কথা জিজ্ঞাসা করি—'

সে বলল, 'বলুন না।'

সুধীর সঙ্কুচিত হয়ে বলল, 'আপনার সেই বন্ধুর কি বিয়ে হয়ে গেছে?'

সে বলল, 'কার কথা বলছেন?'

সুধীর বলল, সেই যে—এখানে যিনি প্রায়ই আসতেন। ডান গালে তিল আছে—'

সে বলল, 'বুঝেছি। শীলার কথা বলছেন তো?. তার কথা আর বলবেন না। বড় দুঃখের ব্যাপার। বড় বিশ্রী কাণ্ড হয়ে গেছে।'

সুধীর বলল, 'কী হল!'

সে বলল, 'বিয়ের আগের দিন ধরা পড়ল, লোকটা একটি চীট। রায়পুরে ওর আর একজন স্ত্রী আছে। চাকরী-বাকরী সব মিথ্যে কথা। ভাগ্যে আগে থেকেই সব জানা গিয়েছিল। নইলে কি হত বলুন তো?'

জিনিস নিয়ে মেয়েটির বান্ধবী চলে গেল।

সুধীর খানিকক্ষণ স্তব্ধ হয়ে রইল। এতক্ষণে সে বুঝতে পেরেছে এইজন্যেই মেয়েটি আর আসে না। বোধহয় কোনদিনই আসবে না। এ দোকান এখন নিশ্চয়ই তার কাছে সব চেয়ে অপ্রিয়। বিষের সমান। যেখানে সে প্রায় রোজ আসত, সেখানে সে আর কোনদিনই আসবে না।

ছেলেটি শুধু মেয়েটিকেই ঠকায়নি, প্রিয়তমেরও বড় লোকসান করে গেছে।

অপছন্দ

ষ্টুডিয়োর এই ঘরখানা থেকে প্রথমেই চোখে পড়ে শানবাঁধানো বড় পুকুরটি। এই বর্ষায় বেশ ভরে উঠেছে। জল কানায় কানায় টল টল না করলেও তাকে অপূর্ণ বলে আর মনে হয় না। পুকুরের পর খানিকটা ফাঁকা জমি। মাটি দেখা যায় না। মাটির ওপরে ঘাসের আস্তরণ। মালী দু-এক দিন বাদে বাদেই সমান করে ছেঁটে দেয়। সবুজ গালিচার মতই মনে হয় এখান থেকে। তারপর কম্পাউণ্ডের প্রান্ত ঘেঁষে তমাল না থাকলেও তাল আর নারকেলের সারি আছে। তার ফাঁকে ফাঁকে বি. টি. রোডের যানবাহনের আভাস। যাত্রীদের দেখা যায় না, পথও দেখা যায় না, শুধু গাছগুলির ফাঁকে ফাঁকে দু-একটা দ্বিতল বাসের চকিত দেখা মেলে।

অনেকক্ষণ থেকে টিপ টিপ-টিপ-টিপ করে বৃষ্টি পড়ছে। আকাশে মেঘ। সে মেঘ ইচ্ছা করলে প্রবল ধারায় ধরণীকে ভাসিয়ে দিতে পারে। কিন্তু সে দিকে তার মন নেই। তার চেয়ে ঝির ঝির করে সন্ধ্যা পর্যন্ত ঝরবে সেই তার বাসনা।

পরিচালক ত্রয়ীর একজন নির্মল মৈত্র কাজকর্ম রেখে সামনের দিকে তাকিয়ে চুপ করে বসেছিল। চেয়ে চেয়ে দেখছিল ঝিরঝিরে বৃষ্টি। একটু কান পাতলে শোনাও যায় কিন্তু সে কি কানে কানে শোনা না মনে মনে শোনা ভালো করে বোঝা যায় না।

এবার একটু শ্বাস ফেলবার সময় এসেছে নির্মলদের। আর যাই হোক স্ক্রিপ্‌ট্‌ লেখা শেষ হয়েছে। মাস ছয়েক ধরে ধ্বস্তাধ্বস্তি চল-ছিল মূল গল্পের লেখকের সঙ্গে। তাঁর ছোট গল্পকে সম্প্রসারণের দায়িত্ব তিনি নিজে নিয়েছেন। কিন্তু তাঁর কাছ থেকে কাজ আদায়

করা বড় শক্ত। যা ছিল বীজ যা ছিল অঙ্কুর তাকে মহীরুহ করা তো দূরের কথা চারাগাছ করতে গেলেও চেহারা অন্য রকম হয়ে যায়। ঘন রস আস্তে আস্তে ফিকে হতে থাকে। আর তার ফলে লেখকের মেজাজ ঠিক থাকে না। অমন শান্তশিষ্ট মানুষের আচার আচরণ কথা-বার্তা ঝাঁঝালো হয়ে ওঠে। পরস্পরের মধ্যে যে রসের সম্পর্ক জমে তার নাম রৌদ্ররস। তাই তিনি পালিয়ে পালিয়ে বেড়ান। শুধু কথা দেন, আর কিছু দেন না। আসব বলে আসেন না। বাড়িতে হানা দিলে অন্য কাজের অজুহাত দেখান। আর না হয় সেই স্কুলের ছেলের মত ছদ্ম মাথাধরা কি পেটের অসুখের আশ্রয় নেন। পঞ্চাশ হাজারী ফিল্মষ্টারদের বরং বশে আনা সহজ কিন্তু লেখকদের কথা ভাবলে এখন নির্মলের সর্বাঙ্গ অবশ হয়ে আসে।

দায় এত দিনে চুকেছে। লেখকের যেটুকু করবার তিনি করেছেন। এখন তাঁকে বাদ দিয়ে শুধু তাঁর লেখার সঙ্গে সম্পর্ক রাখলেই চলবে। রস-আস্বাদনের সেই হল নিরাপদ পথ। ওঁদের সঙ্গে ব্যক্তিগত মোলাকাত না করাই ভালো।

স্ক্রিপ্‌টের মোটা ফাইলটা হাতের কাছেই আছে। আগাগোড়া আর-এক বার পড়ে দেখবার সঙ্কল্প নিয়েই বসেছিল নির্মল। কিন্তু এই মুহূর্তে আজ আর ও বস্তু ছুঁতে ইচ্ছা করছে না। তার চেয়ে চুপচাপ বসে বৃষ্টির দিকে তাকিয়ে সিগারেট টানা ঢের আরামের।

অন্য দুই সহকর্মী কমল সেন আর প্রবোধ রক্ষিত কোথায় গিয়ে আড্ডা জমিয়ে বসেছে। তা বসুক। এই মুহূর্তে ওরা কেউ এসে না এসে পড়লেই নির্মল খুশি হয়। যদিও ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শিব ত্রিমূর্তি তারা অবিচ্ছিন্ন তবু মাঝে মাঝে একা থাকা দরকার। না হলে নিজের মনের মূর্তি দেখা যায় না। আত্মজনের চোখে নিজের এক রকমের চেহারা ফোটে, নির্জনতার মুকুরে আর-এক রকম। মানুষ নিজের দুই মুখই দেখতে চায়।

এই মুহূর্তে কেউ না এসে পড়লেই ভালো। এখন কেউ আসুক

নির্মল তা চায় না। এককাপ চায়ের জন্য চাকরকে পর্যন্ত ডাকতে ইচ্ছা করছে না। অতিপ্রিয় লেখকও নীল থলির মধ্যে আত্মগোপন করে রয়েছেন। ইচ্ছা করছে না চেয়ার ছেড়ে উঠে বার করে আনতে। মাঝে মাঝে নিশ্ছিদ্র আলস্য বড় মধুর লাগে। বিশেষ করে সে আলস্য যদি ঝিরঝিরে বৃষ্টিতে গা পেতে দিয়ে ভেজে যেমন করে ভিজছে পুকুরের লালরঙের শানবাঁধানো ঘাট দু দিকে সুরকি-ঢালা দুটি সরু পথ, তাল আর নারকেলের পাতা। সবই নির্মলের মত গা পেতে রয়েছে, গা ছেড়ে দিয়েছে। শুধু বি. টি. রোডের বাস এ দিক থেকে ও দিকে ও দিক থেকে এ দিকে ছুটে পালাচ্ছে না কি বৃষ্টির সঙ্গে খেলছে ছুটোছুটি খেলা।

চেয়ারে ঠেস দিয়ে টেবিলের ওপর দুটো পা তুলে দিল নির্মল। ভাবতে ভালো লাগছে আজ কোন কাজ নেই। অফিসে এসেও আজ ছুটি নিয়েছে। মনে পড়ল ছেলেবেলায় স্কুলে যাওয়া পণ্ড হলে কি আনন্দ না হোত। আজ সেই রেইনি ডে-র আনন্দ ভোগ করছে নির্মল। আজ কোন কাজ নেই। আজ কোন কাজ নয়—সব ফেলে দিয়ে—

'ছন্দ বদ্ধ গ্রন্থগীত এসো তুমি প্রিয়ে
কবিতা কল্পনা লতা।'

তারপর আর মনে পড়েছে না। নিজের মনেই হাসল নির্মল। কবিতা কল্পনা লতা চিরকালের জন্য পালিয়েছে। কলেজে পড়বার সময় গোপনে গোপনে কাব্যচর্চা করত। লিখত, পড়ত। কলেজ ম্যাগাজিনে দু-একটা কবিতা ছাপাও হয়েছিল। তারপর বেরিয়ে এসে জীবনযুদ্ধে ক্ষতবিক্ষত হতে হতে মনের যত রস সব মাথার ঘাম হয়ে পায়ের ওপর টপ টপ করে পড়তে লাগল। নানা ঘাট ঘুরে নানা আঘাটা পার হয়ে শেষ পর্যন্ত এই চিত্রপরিচালনার পথে এসে গোটা জীবনটাই অন্য পথে চালিত হয়েছে। বইপত্রের সঙ্গে আর বিশেষ সম্পর্ক নেই। এখন সব লেখা পড়া সেলুলয়েডের ওপর। জীবনের শুরুতে ছিল শ্লেট শেষ হবে হয়তো সেলুলয়েড দিয়ে।

'আচ্ছা, এইটাই কি 'ত্রিকাল' পরিচালক-গোষ্ঠীর অফিস?'

আরে, দোরের সামনে একজন ভদ্রমহিলা এসে দাঁড়িয়েছেন যে। নির্মল তাড়াতাড়ি টেবিলের ওপর থেকে পা নামিয়ে নিয়ে সোজা হয়ে উঠে বসল, 'আজ্ঞে হ্যাঁ, এইটাই ত্রিকাল।'

'আসতে পারি?'

'নিশ্চয়ই। আসুন।'

সামনের চেয়ারটা দেখিয়ে দিয়ে নির্মল আগন্তুককে বসতেও বলল।

কিন্তু মেয়েটি বসল না। না বসবার কারণ আর অস্পষ্ট নেই নির্মলের কাছে। নাম পর্যন্ত মনে আছে। গায়ত্রী সান্যাল। মেয়েটিও যে তাকে চিনেছে তাতে আর কোন সন্দেহ নেই। তার চোখ ফিরিয়ে নেওয়ার ভঙ্গিতে তার দাঁড়িয়ে থাকায় সেই পরিচয় স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। আশ্চর্য, মাত্র একদিন ঘণ্টাকয়েকের জন্যে দেখা। তবু কেউ কাউকে ভুলতে পারে নি। পারলে বড় ভাল ছিল।

লালরঙের ছোট্ট ছাতাটি ভিজে গেছে। জল পড়ছে ফোঁটায় ফোঁটায়। আর একহাতে বটুয়ার মত ভ্যানিটি ব্যাগ। তার রঙ নীল। শাড়ির রঙ কলাপাতার। গায়ের রং মাজা গৌর। চোখের তারাদুটি ঘন-কালো। মুখের ডৌল লম্বাটে। চিবুকের ওপর একটি জড়ুল। কোন সন্দেহ নেই এ সেই কোন্নগরের গায়ত্রী।

নির্মল আবার বলল, 'বসুন। কিছু যদি মনে না করেন আপনার ছাতাটি রেখে দিই'

গায়ত্রী একটু লজ্জিত হয়ে বলল, 'না, আমিই রেখে আসছি।' ব্যাগটা টেবিলের ওপর রেখে ছাতাটা সে দেয়ালে ঠেস দিয়ে রাখল।

নির্মল আবার বলল, 'বসুন।'

গায়ত্রী বসল। কিন্তু নির্মলের ঠিক সামনের চেয়ারে নয়, একটু দূরে কোণের দিকে নিচু গদি-আঁটা যে চেয়ারটা রয়েছে তাতে গিয়ে আসন আর আশ্রয় নিল।

একটু বাদে নির্মল বলল, 'বলুন কি করতে পারি?'

গায়ত্রী একটু ইতস্তত করে জিজ্ঞাসা করল, 'আপনিই কি ত্রিকাল?'

নির্মল একটু হেসে বলল, 'আজ্ঞে না, আমি এক কাল মাত্র। আমার আরো দু জন কলিগ আছেন। ও দিকে রয়েছেন। তাদের কি খবর দেব? আপনার কি দরকার বলুন।'

গায়ত্রী মৃদুস্বরে বলল, 'আপনারা অভিনেত্রী চাই বলে বিজ্ঞাপন দিয়েছিলেন। আমি সেই সম্পর্কে দেখা করতে এসেছি।'

'কে অভিনয় করবেন?'

'আমি।'

নির্মল বিস্মিত হয়ে বলল, 'আপনি? আশ্চর্য!'

গায়ত্রী মুখ নিচু করে রইল।

নির্মল বলল, 'আমাদের নিয়ম আগে ফোটোর সঙ্গে অ্যাপলিকেশন পাঠাতে হয়। তারপর আমরা ইণ্টারভিউর ডেট দিয়ে চিঠি লিখি।'

গায়ত্রী বলল, 'অনেক জায়গায় চিঠি লিখেও কোন জবাব পাওয়া না। তাই আমি নিজেই চলে এসেছি।'

নির্মল বলল, 'বেশ তো, আজই আমরা আপনার ইণ্টারভিউ নিতে পারি। আচ্ছা, আমি ওদের দুজনকে খবর দিচ্ছি। আপনি একটু বসুন। গোবিন্দ! গোবিন্দ!'

স্বরগ্রাম উঁচুতে তুলে চাকরকে ডাকল নির্মল।

একটু বাদেই গোবিন্দের দেখা মিলল।

নির্মল বলল, 'দেখ্ তো, ওঁরা বোধহয় বিশ্বতোষবাবুর ঘরে আছেন। নিয়ে আয় ডেকে। বলিস একজন ভদ্রমহিলা এসেছেন।'

গোবিন্দ চলে গেলে নির্মল বলল, 'কিছু যদি মনে না করেন একটা কথা বলি।'

'বলুন।'

নির্মল বলল, 'আমি আপনাকে চিনেছি। মনে হচ্ছে আপনিও আমাকে চিনতে পেরেছেন।'

গায়ত্রী চুপ করে রইল।

নির্মল বলল, 'কোন্নগরে আমাদের দেখা সাক্ষাৎ হয়েছিল। মনে আছে আপনার ?'

গায়ত্রী চোখ নামিয়ে মৃদুস্বরে বলল, 'আছে।'

নির্মল বলল, 'সেই সান্যাল বাড়ির মেয়ে হয়ে আপনি সিনেমায় অভিনয় করতে এসেছেন। শুনে ভারি আশ্চর্য লেগেছে আমার। আপনার মামা আপত্তি করবেন না ?'

গায়ত্রী বলল, 'মামা আর নেই। মা আমি আর আমার ভাই বছর দুই হল বেলগাছিয়ায় আলাদা বাসা করেছি।'

নির্মল বলল, 'ও।'

তারপর একটু চুপ করে থেকে বলল, 'কিন্তু আপনার মা-ই কি রাজী হবেন ?'

গায়ত্রী বলল, 'মাকে রাজী করিয়ে নিতে হবে।। অনেক ভদ্রঘরের মেয়েই তো এ লাইনে এসেছে। সংসারের অবস্থা তো মা জানেন। যে কোন ভাবেই হোক—।'

বলতে বলতে গায়ত্রী থেমে গেল। আর কিছু বলবার দরকারই বা কি। নির্মল নিজের মনেই শূন্যস্থান পূরণ করে নিয়েছে।

নির্মল কি যেন বলতে যাচ্ছিল কোলাহল তুলে প্রবোধ রক্ষিত ঘরে ঢুকল। নির্মলরা তিনজনে মিলে একটি ইউনিট একথা বলে বেড়ালে কি হবে প্রবোধ একাই একশ। সে বলতে বলতে এল, 'কি নির্মল, এখন বুঝি আর মন টিঁকছে না। ভদ্রমহিলার ভাঁওতা দেওয়া হচ্ছে ? এই বৃষ্টিবাদলের মধ্যে তোমার জন্যে কোন কুলবধূ অভিসারে বেরিয়েছে শুনি ?'

নির্মল চোখের ইসারা করতেই প্রবোধ গায়ত্রীকে দেখতে পেল এবং লজ্জিত হয়ে জিভ কাটল। কমল দুটি চোখকে প্রায় রক্তকমল করে শাসনের ভঙ্গিতে সহকর্মীর দিকে তাকাল। বয়সে তিনজনই প্রায় সমান। বত্রিশ থেকে পঁয়ত্রিশের মধ্যে বয়স। কিন্তু গাম্ভীর্যে গুরুত্বে কমলই অভিভাবক। প্রবীণতার দাবী তারই বেশি।

চেয়ারে বসে সে নির্মলের দিকে তাকাল।

নির্মল পরিচয় করিয়ে দিয়ে বলল, 'এঁরা আমার দুই সহকর্মী। আর ইনি আমাদের বিজ্ঞাপন দেখে দেখা করতে এসেছেন।'

কমল মৃদু হেসে বলল, 'ও। বেশ তো।'

নমস্কার বিনিময়ের পর কমল নির্মলের দিকে চেয়ে বলল, 'তুমি কি কিছু জিজ্ঞেস টিজ্ঞেস করেছ?'

নির্মলের মুখ একটু আরক্ত হল, বলল, 'না। যা জিজ্ঞেস করবার, জানবার শোনবার তোমরা ওই পাশের ঘরে গিয়ে কর। আমি ততক্ষণ স্ক্রিপ্‌ট্ দেখছি। মনে হচ্ছে দু-একটা জায়গায় একটু রি-রাইট করা দরকার।'

কমল নিজের টাকে সস্নেহে হাত বুলোতে বুলোতে হাসল, বলল, 'দরকার তা তো বুঝতে পারছি। কিন্তু ইণ্টারভিউ নেওয়াও তো দরকার। তুমি যাবে না?'

নির্মল বলল, 'না না। আমাকে এ কাজটা করতে দাও।'

বলে নির্মল সত্যিই ফাইল খুলে বসল। গভীর মনোযোগ দিল চিত্রনাট্যে। যেন জীবননাট্যে তার আর কোন আসক্তি নেই।

কমল সহকর্মীর অনিচ্ছা আর ভাব ভঙ্গি দেখে কিছু একটা অনুমান করে নিল। আর কথা না বাড়িয়ে গায়ত্রীর দিকে তাকিয়ে বলল, 'আপনি দয়া করে ও ঘরে চলুন। চল হে প্রবোধ।'

ওরা সবাই পাশের বড় ঘরটায় চলে গেলে নির্মল স্ক্রিপ্‌টের খাতাটা ফের ঠেলে সরিয়ে রাখল। তার আর আলাদা করে ইণ্টারভিউ নেওয়ার দরকার নেই। কোন্নগরের একটি বাড়ির বৈঠকখানায় সে তিন বছর আগেই গায়ত্রীর ইণ্টাবভিউ নিয়ে রেখেছে। আশ্চর্য, সে বাড়িরও সামনে ছিল পুকুর আর চারিদিকে সুপারি নারকেলের বাগান। সেদিন অবশ্য বৃষ্টি ছিল না। শরতের বিকালে কনে দেখা আলোর কথা মনে রেখেই নির্মল দল নিয়ে হাজির হয়েছিল। দলে ছিল ঘটকবেশী বন্ধু প্রশান্ত হালদার, আর একটু দূর সম্পর্কের দুই

বউদি। এ্যামেচার ঘটক প্রশান্ত নিজের গাড়িতে করেই মহানগর থেকে সেই অনির্দিষ্ট কোন্নগরে তাদের নিয়ে গিয়েছিল।

বেশ ভদ্র পরিবার। সাজানো গোছানো বাড়ি-ঘর। আলাপে ব্যবহারে নির্মলরা মুগ্ধ হল। আহারাদির ব্যবস্থাও কম মুগ্ধকর নয়। লুচি মাংস তারপর গুটি চারেক করে কড়া পাকের সন্দেশ। মিষ্টি আবার বেশি সয় না নির্মলের। একটুতেই মুখ ফিরিয়ে আনে। তবু গৃহকর্তা আর তাঁর স্ত্রীর পীড়াপীড়িতে দুটি নিতে হল। কর্তা বৃত্তিতে উকিল। কিন্তু নির্মলকে ঠিক ফৌজদারী মামলার সাক্ষী মনে করে জেরা করলেন না। পঞ্চান্ন ছাপ্পান্ন বছর বয়সের সৌম্যদর্শন ভদ্রলোক। দেশের রাজনীতি সমাজনীতি নানা বিষয়ে নিয়েই আলোচনা করলেন। অবশ্য সেই ফাঁকে নির্মলের বৃত্তিটার কথাও জেনে নিলেন। 'কি করেন? ফিল্মের ডাইরেকশন দেন?'

একটু থামলেন ভদ্রলোক। পরমুহূর্তে হেসে বললেন, 'বেশ, বেশ। ক'বছর আছেন এ লাইনে?'

নির্মল বলেছিল, 'বছর সাতেক।'

ভদ্রলোক বললেন, 'অত দিন! তা হলে তো যথেষ্ট অভিজ্ঞতা হয়েছে। কত ভালো ভালো ছবি আসে শুনি। আমার আর সময়ই হয় না। বাড়ির ছেলেমেয়েরা দেখে। তবে আপনাদের ইণ্ডাষ্ট্রীর খবর একটু আধটু রাখি। অনেক কেস টেস আসে।'

তারপর মেয়ে দেখার পালা। নির্মলের চেয়ে তার বউদিরাই দেখলেন বেশি। তাঁরা ভিতরে গিয়ে মেয়ের চুল খুলে দেখলেন, হাঁটিয়ে দেখলেন, হাসিয়ে দেখলেন। কোন দিকে কোন খুঁৎ নেই। চমৎকার মেয়ে।

নির্মল শুধু একটু বিদ্যাবুদ্ধির পরিচয় নেওয়ার চেষ্টা করল। জিজ্ঞাসা করল, 'কোন্ পর্যন্ত পড়েছেন?'

'ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করেছি।'

'কোন্ ডিভিসনে?'

'ফার্ষ্ট ডিভিসনে।'

'বাঃ—তারপর আর পড়েন নি?'

গায়ত্রী মুখ নীচু করে বলল, 'বাড়িতে পড়ছি।'

'যে সব বিষয় পড়ছেন তার মধ্যে কোন্‌টা আপনার বেশি ভালো লাগে?'

'সাহিত্য।'

'কবিতা আর গল্প উপন্যাসের মধ্যে সব চেয়ে কোন্‌টা বেশি ভালো লাগে?'।

গায়ত্রী নিজের পছন্দটা ধরিয়ে দিল না, মৃদু হেসে বলল, 'সবই ভালো লাগে।'

নির্মল হেসে বলল, 'ডিটেকটিভ উপন্যাস বোধহয় সবচেয়ে বেশি ভালো লাগে। কি বলুন?'

গায়ত্রী বলল, 'না আমরা ওসব পড়িনে। মামার বারণ আছে।'

অল্পসল্প গানও জানে গায়ত্রী। রবীন্দ্রনাথের দুখানা গান শোনাল। নৈপুণ্য শিক্ষাসাপেক্ষ। তবে গলাটা মন্দ নয়।

বউদিরা সহজে উঠতে চান না। এক ঘণ্টার জায়গায় তিন ঘণ্টা সময় নিলেন। সেই তিন ঘণ্টায় কনেপক্ষ বরপক্ষের কোন কথাই কারো কাছে অজ্ঞাত রইল না প্রকারান্তরে তাঁরা জানিয়ে দিয়ে এলেন মেয়ে তাঁদের খুব পছন্দ হয়েছে। ছেলের পক্ষ থেকে তেমন কড়া রকমের দাবী কিছু নেই। পণ যৌতুক যা দিলে দু পক্ষের মান মর্যাদা বজায় থাকে তাই দিলেই চলবে। মেয়ের যে বাপ নেই সে কথা তাঁরা নিশ্চয়ই বিবেচনা করবেন।

মেয়ের মামা বিদায়ের সময় সবিনয়ে সবাইকে নমস্কার জানালেন। স্মিতমুখেই বললেন, 'দেখাসাক্ষাৎ তো হয়েই গেল। এর পর আলাপ আলোচনা করে পরে—'

প্রশান্ত বলল, 'নিশ্চয় নিশ্চয়। আমি যখন আছি—আর

সমীরও রয়েছে। দেখুন তো সমীরের কাণ্ড। আমাদের খবর দিয়ে এসে সে চলে গেল বর্ধমানে।'

ভদ্রলোক বললেন, 'জরুরী কাজেই গেছে সে। এলে আপনাদের কথা বলব।'

সমীর তাঁর ছেলে আর প্রশান্তর বন্ধু। এই দু জনের যোগাযোগেই ঘটকালিটা এগিয়েছিল।

গাড়িতে আসতে আসতে দুই বউদি উচ্ছ্বসিত সুখ্যাতি করতে লাগলেন মেয়ের। যেমন স্বভাবে তেমনি সৌন্দর্যে, তেমনি ঘর সংসারের কাজের অভিজ্ঞতায়— সব বিষয়ে ভালো।

ইভা বউদি বললেন, 'ওকে বিয়ে করলে তুমি আর আমাদের দিকে তাকাবেই না। আমাদের কদর উঠে গেল।'

রেখা বউদি বললেন, 'তা যায় যাক। এ মেয়ে কিন্তু হাতছাড়া করো না নির্মল ঠাকুরপো। পণ-যৌতুক তুমি যদি এক পয়সা নাও পাও এই কন্যারত্নটি তুমি কোন্নগর থেকে নিয়ে এসো।'

নির্মলেরও মনে মনে তাই ইচ্ছা।

কিন্তু এক সপ্তাহ গেল, দু সপ্তাহ গেল, মাসখানেক কাটতে চলল, কোন্নগরের কোন সাড়াশব্দ নেই। অথচ ওরা না এগোলে তো পাত্রপক্ষ হয়ে নির্মল এগিয়ে যেতে পারে না। তবু শেষ পর্যন্ত সে প্রশান্তের অফিসে ফোন করল, 'কি হে ঘটক, তোমার খবর কি?'

প্রশান্ত বলল, 'ভাই আমাকে মাপ কর। আমি ঠিক বুঝতে পারি নি।'

'ব্যাপারটা কি তাই বল।'

প্রশান্ত আমতা আমতা করে বলল, 'মেয়ের মামা ভারি গোঁড়া। ফিল্ম লাইনের কোন ছেলের সঙ্গে তিনি সম্বন্ধ করতে রাজী নন। এই লাইন সংক্রান্ত অনেক বিশ্রী বিশ্রী কেস নাকি তাঁর জানা আছে সমীর গোড়াতে তোমার অকুপেশন তার বাবার কাছে লুকিয়েছিল। সেখানেই মহা ভুল হয়েছে।'

নির্মল গর্জন করে বলল, 'তোমার মত এমন বেআক্কেল আমি আর ছুটি দেখিনি। আমাকে ডেকে নিয়ে গিয়ে অপমান করবার কি মানে হয়?'

রিসিভারটা রাখল না তো যেন আছড়ে ফেলল নির্মল। আর একটু হলেই ভেঙে চুরমার হয়ে যেত।

তারপর মাস তিনেকের মধ্যে নিজেই দেখে শুনে বিয়ে করেছে নির্মল। প্রশান্তকে দেখিয়ে দিয়েছে ফিল্ম লাইনের লোক ইচ্ছা করলেই বিয়ে করতে পারে। নেহাৎ আজকাল আইনে আটকায় না হলে একটা কেন তিনটা বিয়ে করলেও মেয়ের অভাব হয় না। আইনের সমর্থন নেই আর শহরে বাড়ি বড় ভুল ভ এই যা অসুবিধা।

খানিক বাদে গায়ত্রীকে নিয়ে সহকর্মীরা ফিরে এল। তাদের চোখমুখের ভঙ্গি দেখেই নির্মল বুঝতে পারল ওদের পছন্দ হয়নি।

কমল তবু মৃদু হেসে তার নাগরিক সৌজন্য বজায় রেখে গায়ত্রীকে বলল, 'আচ্ছা, আপনার ঠিকানা তো আমাদের কাছে রইলই। আমাদের ডিসিসন্ পরে জানাবো।'

গায়ত্রী যাওয়ার জন্য তৈরী হচ্ছিল, প্রবোধ বলল, 'সে কি, এক কাপ চা অন্তত খান। আপনাকে খুব টায়ার্‌ড্ দেখাচ্ছে, এক কাপ চা খেয়ে নিন।'

গায়ত্রী বলল, 'না না চা থাক।'

কিন্তু প্রবোধ প্রায় জোর করেই চার কাপ চায়ের অর্ডার দিল।

নির্মল সিগারেট খাবার অছিলায় বাইরে গেল, ইসারায় ডেকে নিল কমলকে। আস্তে বলল, 'কি ব্যাপার?'

কমল বলল, 'চেহারা দেখে খুব তো আশা হয়েছিল। কিন্তু ডেলিভারি উচ্চারণ, হাটা চলা সব ব্যাপারে নিরাশ করেছে। একে ঘষে মেজে নিতে হলে অন্তত ছটি মাস দরকার। অত সময় কই। তোমার জানা-শোনা আছে নাকি হে?'

নির্মল আরক্ত হয়ে বলল, 'না না।'

চা খেয়ে গায়ত্রী আর দেরি করল না। ছাতা আর ব্যাগটি তুলে নিয়ে বেরিয়ে পড়ল। বন্ধুদের পরিহাসের আশঙ্কা সত্ত্বেও নির্মল গেল তার পিছনে পিছনে।

বৃষ্টি থেমেছে। আকাশে শুধু রোদের ঝিলিকই নয় বাঁকা রামধনুর ইসারা।

নির্মল ওর পাশে পাশে ষ্টুডিওর গেট পর্যন্ত চলল।

হঠাৎ গায়ত্রী তার দিকে চোখ তুলে তাকাল। নির্মল লক্ষ্য করল ওর মুখখানা বড় ম্লান দেখাচ্ছে। সিঁথি সাদা। সেখানে এখনো সিঁদুরের রেখা পড়ে নি।

গায়ত্রী বলল, 'দয়া করে একটা কথা সত্যি করে বলবেন?'

নির্মল বলল, 'বলুন।'

গায়ত্রী বলল, 'পছন্দ হয়নি—না?'

নির্মল অনুরোধ না রেখে মিথ্যা করে বলল, 'আমাদের কাষ্টিং আগেই হয়ে আছে। মানে—ইয়ে—বুঝতেই তো পারছেন—।'

গায়ত্রী বলল, 'আমি জানতাম।'

তারপর আর কোন দিকে না তাকিয়ে রাস্তা পার হয়ে সোজা চলে গেল। একটা বাস তাকে এক মুহূর্ত আড়াল করে রাখল, তারপর তাকে তুলে নিয়ে শ্যামবাজারের দিকে চলে গেল।

নিঃসঙ্গ নির্মল রাস্তার উপরে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। মনে মনে ভাবল এই ভালো। এই বিভ্রান্তিটুকুই ওর থেকে যাক। ও এই মনে করেই সান্ত্বনা পাক, নিজের অযোগ্যতার জন্যে নয় একজনের হীন প্রতিশোধের জন্যেই ওর এখানে কাজ হয় নি, হয় তো তাতেই দুঃখের তীব্রতা কম হবে।

সিগারেট

সকালে কাগজ-কলম নিয়ে বসেছিলাম। একটি গল্প আসি আসি করেও সশরীরে আবির্ভূত হচ্ছে না। যে দেহ সে নিতে চাইছে তা আমার মনঃপুত নয়। ফলে সে লেখার বদলে কাগজের ওপরে রেখাপাত করে চলেছিলাম, দরজা ঠেলে একজন অভ্যাগত ঘরে ঢুকলেন।

আমি বললাম, 'আরে বিজয়দা যে। আসুন আসুন।'

বিজয়দা আমার টেবিলের ওপর একটু চোখ বুলিয়ে বললেন, 'লিখছিলে নাকি ? তাহলে থাক, আর বসব না। ডিষ্টার্ব করব না তোমাকে।'

রেখাসঙ্কুল সাদা কাগজটা লুকোবার মত করে সরিয়ে রেখে আমি বললাম, 'আরে না-না। বসুন বসুন। কতদিন পরে এলেন।'

বিজয়দা আর আপত্তি করলেন না। আমার পাশের ইজিচেয়ারটায় ঠেস দিয়ে বসে একটু হেসে বললেন, 'তোমরাই বেশ আছ।'

আমি কথাটা ঠিক বুঝতে না পেরে বললাম, 'কি রকম ?'

বিজয়দা বললেন, 'মানে তোমাদের পেশার কথাটা বলছি। বেশ মজার পেশা।'

হেসে বললাম, 'কি করে ?'

বিজয়দা বললেন, 'এই ধর তোমার কারবারে ক্যাপিটালের চিন্তা নেই, পার্টনার পালাবার ভয় নেই। বেশ আছ।'

ওসব অসুবিধা না থাকলেও লেখকের বৃত্তিটা অবিমিশ্র সুখের কিনা তা নিয়ে তর্ক করলাম না। কিন্তু বিজয়দার ব্যবসায়িক পরিভাষাগুলি শুনে কিছু কৌতুক বোধ করলাম। আমি যতদূর জানি বাণিজ্য দিয়ে লক্ষ্মীকে বাঁধবার জন্যে বার তিনেক চেষ্টা করেছিলেন বিজয়দা। প্রথমে

গিয়েছিলেন প্রেস আর পাবলিশিং-এর দিকে। অত টাকা কোত্থেকে জোটালেন তিনিই জানেন। খাড়া করলেন লিমিটেড কোম্পানী। নিজে হলেন ম্যানেজিং ডিরেক্টর। সে ব্যবসা দু বছরের বেশি টেকেনি। তারপর ও সব ছেড়ে একেবারে কাঁচা মালের দিকে নজর দিলেন। মাছের চাষ, মৎসাশী বাঙালীকে যদি মাছের লোভ দেখানো যায় লাভের টাকা গুণে শেষ করা যাবে না। কোম্পানী খুললেন, ভেড়ি কিনলেন গোটা কয়েক। তারপর দু-তিন বছরের মধ্যে সবই গেল। মাছের খোঁজ মিলল না। জলাশয়গুলি জলের দরে ছাড়তে হল। শুনেছি মহাজনেরা নাকি এখনো ওঁর পিছু ছাড়েননি। তৃতীয়বার বিজয়দা ফের ডাঙার দিকে তাকালেন। কলকাতার পূর্বাঞ্চলে শিক্ষা বিস্তারের কথাটা মাথায় এল তাঁর।

একটি বড় রকমের কলেজ খুলতে পারলে অনেক ছাত্র-ছাত্রীর। সেখানে জায়গা হয় নিজেদের হাতেও দু পয়সা আসে। কিন্তু প্ল্যানটা কাগজ-পত্রের গণ্ডী আর পার হতে পারেনি।

যে সব লোকের টাকা বিজয়দা নষ্ট করেছেন তাঁরা তাঁর নামে নানা ধরণের অপবাদ দিয়ে থাকেন। চোর, জোচ্চোর বলতেও দ্বিধা করেন না। কিন্তু আমি বিজয়দার পারিবারিক অবস্থার কথা জানি। তাঁর ঘরদোর, স্ত্রী-পুত্রের চেহারা দেখে অনুমান হয় না যে পরস্ব হরণ করে তিনি নিজের ব্যাঙ্কের একাউন্ট স্ফীত করেছেন। তাঁরও যথাসর্বস্বই গেছে। তাঁর চরিত্রে দোষের অভাব নেই। খামখেয়ালী, বদমেজাজী। যতখানি বাকপটু তাঁর সিকি পরিমাণও কর্মক্ষম নন। তাঁর মাথায় বড় বড় আইডিয়ার সম্পদ প্রায় সব সময় থাকে। বিপদ বাধে সেগুলিকে কাজে লাগাতে গিয়ে। তিনি হিসাব করতে ভালোবাসতেন না এবং ব্যয় বাহুল্যকে আভিজাত্যের নিদর্শন বলে মনে করতেন। ব্যবসায়ে নেমে তাঁর এই অতি ব্যয়ের অভ্যাস আরো বেড়ে গেল। অফিসের জন্য বড় বাড়ি ভাড়া করলেন, দামী দামী আসবাবপত্র এল। যেখানে একজন লোক রাখলে হয় সেখানে তিনজনকে লাগালেন। দরকার

হল লেডি ষ্টেনোগ্রাফারের। দেখে-শুনে আমার তখনই মনে হয়েছিল বিজয়দা ব্যবসায়ে নামেননি, বিলাসিতায় মেতেছেন।

আমি বলেছিলাম, 'বিজয়দা এত খরচ করছেন কেন?'

বিজয়দা জবাব দিয়েছিলেন, 'তুমি বুঝবে না কল্যাণ, প্রেষ্টিজটা হল বিজনেসের সেরা ক্যাপিট্যাল। বাঙালীরা কোনদিন অ-বাঙালীর মত ভিখারী সেজে বিজনেস করতে পারবে না। বাঙালীদের জাত আলাদা, ধাত আলাদা, তাদের ব্যবসার টেকনিকও তাই ভিন্ন রকমের।'

টেকনিকের মধ্যে দেখতাম গাড়ি ছাড়া বিজয়দা চলেন না, দামী স্যুট ছাড়া পরেন না, আর অগ্নি-মুখ গোল্ড ফ্লেক তাঁর দু আঙুলের ফাঁকে অনির্বাণ জ্বলে।

তারপর গত দশ-পনের বছরের মধ্যে সবই গেছে, সবচেয়ে বেশি গেছে সুনাম। তাঁর বন্ধুব দল বিজয় চক্রবর্তীর নাম শুনতে পাবেন না। দেখলে এগিয়ে যান। পাছে ধার চেয়ে বসেন বিজয়দা। ইদানীং ওই অভ্যাসটিও হয়েছে। যা ধার করেন তা আর শোধ দেন না। দু-একবার চাকরী-বাকরির চেষ্টা করেছিলেন। ঢুকেও ছিলেন কোন কোন অফিসে। কিন্তু দু-চার মাসের বেশি কোথাও টিঁকেছিলেন বলে জানিনে। এমনি করে পঞ্চাশ পার করে দিয়েছেন বয়স। দেখতে আরো বুড়ো দেখায়। যৌবনে সুপুরুষই ছিলেন। আকারে দীর্ঘ বর্ণে গৌর। সে চেহারার প্রায় কিছুই নেই। দু-পাটি থেকেই সামনের দিকে দু-তিনটি করে দাঁত পড়েছে। এখনো বাঁধিয়ে নেননি। তাঁর মত সৌখীন মানুষের এই বৈদান্তিক ঔদাসীন্য কেন জিজ্ঞাসা করেছিলাম। তিনি হেসে জবাব দিয়েছিলেন, 'আর দাঁত, নখই যখন গেছে, দাঁত দিয়ে আর কি হবে।'

বিজয়দার সঙ্গে আমার জানা-শোনা ছেলেবেলা থেকে। একই মফঃস্বল সহরের আমরা বাসিন্দা ছিলাম। অল্প বয়স থেকেই তাঁর মনে আকাঙ্ক্ষা প্রবল ছিল। তাঁর কোন কথাই দৈর্ঘে-প্রস্থে ছোট ছিল না। পৃথিবীর সব খোঁজ-খবর তিনি রাখেন। জ্ঞান-বিজ্ঞানের

সব শাখা-প্রশাখা থেকেই তিনি ফল আহরণ করেছেন। তাঁর কথা আমরা সবাই অবাক হয়ে শুনতাম। স্বচ্ছল অবস্থাপন্ন ঘরের সুদর্শন ছেলের মুখে কিছুই বেমানান লাগত না। স্কুলের ডিবেটিং ক্লাবে তাঁর জুড়ি ছিল না। ম্যাট্রিকুলেশনে দশ টাকার একটা স্কলারশিপও পেয়েছিলেন। পরে অবশ্য ক্যারিয়ার আর তত ভালো হয়নি। কিন্তু ওঁর মধ্যে বড় হবার যে প্রচুর সম্ভাবনা রয়েছে সে কথা তিনি শুধু নিজেই বিশ্বাস করতেন না তাঁর বাপ-মা, আত্মীয়স্বজন, বন্ধু-বান্ধবের মনেও তা সঞ্চারিত করতে জানতেন। তিনি পরীক্ষায় খারাপ করলে অসুখবিসুখ কি প্রতিকুল গ্রহ-উপগ্রহের দোহাই দেওয়া হত। ব্যবসা-বানিজ্যে লোকসান হলে দোষ চাপত পার্টনারের ঘাড়ে। বিজয়দা যেন কোন অন্যায় করতেও পারেন না, ভুল করতেও পারেন না। তাঁর চরিত্র নির্দোষ বুদ্ধি নির্মল। হয়তো তাঁর অসাধারণ বাক বৈদগ্ধ্য এই ইন্দ্রজালের সৃষ্টি করে থাকবে। তাঁর চেহারা আর চাল-চলনের আভিজাত্যও তাঁকে সেই মোহ বিস্তারের কাজে অনেকখানি সাহায্য করেছিল। যতদিন জানি এখন আর সে সব নেই। সেই ইন্দ্রজাল টুকরো টুকরো হয়ে ছিঁড়ে পড়েছে। বিজয়দার ভাইরা সব আলাদা হয়ে গেছেন, বন্ধুরা বিচ্ছিন্ন। স্ত্রী আর পাঁচটি ছেলেমেয়ে নিয়ে নারকেলডাঙার ষষ্ঠীতলা লেনে পুরান বাড়ির একতলায় দুখানা ঘর ভাড়া নিয়ে বিজয়দা সেখানে বাসা বেঁধেছেন। বড় ছেলে দুটির কলেজের পড়াশুনো চলতে চলতে বন্ধ হয়েছে। চাকরি-বাকরির কোন সুবিধা হয়নি। মেয়েটির এখন বিয়ে দিলেই হয়। কিন্তু পণ-যৌতুকের সংস্থান নেই। আগে আগে বৌদির সঙ্গে সাহিত্য নিয়ে আমার আলাপ পরিচয় আলোচনা হত। উপন্যাস পড়া এবং তা নিয়ে সমালোচনা করায় তাঁর দারুণ উৎসাহ ছিল। এখন আর সে সব কিছুই নেই। এখন গেলেই নানা রকম অভাব, অনটন, অশান্তির অভিযোগের কথা ওঠে। আগে আগে স্বামীর দোষ চাপতে চেষ্টা করতেন বৌদি। এখন স্পষ্টই বলেন, 'ওঁর জন্যই সব নষ্ট হল।'

বিজয়দার মত মানুষ যে এই বয়সে এই অবস্থায় এসে বিশ্ব সংসারের উপর বিরূপ হবেন, আর সাহিত্য, সভ্যতা সংস্কৃতি রাজনীতিকে বিদ্রূপ করবেন তাতে বিস্ময়ের কিছু নেই। আমি বিস্মিত হইনে বিশেষ কোন বাদ-প্রতিবাদও করিনে। তাঁর কথা শুধু শুনে যাই মাঝে মাঝে হু-একবার হাঁ-হু করি। বিজয়দার পক্ষে তাই যথেষ্ট। তিনি নিজেই বাদী নিজেই প্রতিবাদী। বিপক্ষের সম্ভাব্য যুক্তিগুলি তিনি নিজেই খাড়া করেন। তারপর আরও ধারাল অস্ত্রে কচু গাছের মত সেগুলি কুচি কুচি করে কেটে দিগ্বিজয়ীর উল্লাস বোধ করেন। আমি শুধু তাঁকে বসবার আসন দিই ফাঁকে ফাঁকে চা আর ধূমপানের ব্যবস্থা করি।

অবশ্য সিগারেটের প্যাকেট তাঁর প্রায় পকেটেই থাকে। এখনো তাঁর আধ ময়লা পাঞ্জাবীর পকেটের ভিতর থেকে উজ্জ্বল গোল্ড ফ্লেকের বাক্স বেরিয়ে আসে। সব সময়েই যে তিনি দামী সিগারেট খান তা নয়। কম দামীও চলে। কিন্তু গোল্ড ফ্লেক যে এখনো কি করে জোটে তা ভেবে আমি মাঝে মাঝে অবাক হই।

বিজয়দা এসে বসবার সঙ্গে সঙ্গে আমি ছোট টিপয়টা তাঁর সামনে টেনে দিলাম আর উঠে গিয়ে সংগ্রহ করে আনলাম ছাইদানিটি। এই বস্তুটির সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ সম্পর্কের দরকার নেই। বিজয়দারও যে বিশেষ সম্পর্ক আছে তা তাঁর ধরণ-ধারণ দেখে মনে হয় না। কারণ ছাইদানি থাকুক আর না থাকুক তিনি আমার লেখার ঘরখানিকেই একটি ভস্মপাত্র মনে করে যত্রতত্র ছাই ছিটতে থাকেন। তিনি উঠে চলে যাওয়ার পর খালি প্যাকেট, সিগারেটের টুকরো আর ছাই জীবন আর জগৎ সংসারের অকিঞ্চিৎকরতার সাক্ষী হিসাবে পড়ে থাকে।

সব জেনেও অ্যাসট্রেটা তাঁর দিকে এগিয়ে দিলাম। কিন্তু অবাক কাণ্ড। চেইন স্মোকার বিজয়দা সঙ্গে সঙ্গে সিগারেট ধরালেন না ছাই দানিটির দিকে তাকিয়ে মৃদু একটু হাসলেন। যেন জাতিস্মর পূর্বজন্মের কোন স্মারক দ্রব্যকে হঠাৎ দেখতে পেয়েছেন। বললাম, ,কি ব্যাপার বিজয়দা? সিগারেট ফুরিয়ে গেছে বুঝি? আনিয়ে দেব?'

তিনি বললেন, 'না ভাই তার আর দরকার নেই।'

বললাম, 'কেন বলুন তো। আজ হঠাৎ এত সংকোচ কিসের আপনার।'

বিজয়দা বললেন, 'সংকোচ নয়, প্রয়োজনই ফুরিয়েছে। সিগারেট আমি ছেড়ে দিয়েছি।'

আমি একটু কাল বিস্মিত হ'য়ে থেকে বললাম, 'সে কি, আপনি শুনেছি, তের-চৌদ্দ বছর বয়সে সিগারেট ধরেছিলেন।'

তিনি বললেন, 'ঠিকই শুনেছ।'

আমি বললাম, 'তাহলে ছাড়লেন কেন ? ডাক্তার বারণ করেছেন?'

বিজয়দা একটু হেসে বললেন, 'মহা ডাক্তারও আমার কিছু করতে পারত না যেমন মহামাষ্টার মানে হেড মাষ্টারও পারেননি। স্কুলে তখনও বেত মারা চালু ছিল। প্রথম যেদিন ধরা পড়ি, পিঠখানা একেবারে লাল করে ফেলেছিলেন। কিন্তু বুক তাতে দমেনি। মাষ্টারদের পর বাবা আর কাকাও আমার ধূমপানে কম বাধা দেননি। কিন্তু তাঁদের সব চেষ্টা নিষ্ফল হয়েছে। তাবপর সংস্কারের কাজে হাত দিয়েছিলেন তোমার বৌদি। গোড়ার দিকে সকলের মত আমাদেরও নতুন প্রেমে নতুন বধূ আগাগোড়া কেবল মধু। মুখের কাছে মুখ এলেই সে তাড়াতাড়ি পাশ ফিরে শুয়েছিল। বলেছিলাম 'কি হল ?'

সে আপত্তি জানিয়ে বলছিল, 'তোমার মুখে ভারি গন্ধ।'

'বলেছিলাম, 'মদের গন্ধ নয়, সিগারেটের গন্ধ,।'

সে হেসে বলে- ছিল 'জানি গো জানি। তা আর আমাকে বলে দিতে হবে না। কিন্তু কেন অত সিগারেট খাও বল তো।'

জবাব দিয়েছিলাম, 'খাই মুখের আঁশটে গন্ধ ঢাকবে বলে। মদ যেমন খারাপ আসলে মুখমদও তেমনি। দেখতে ভালো শুনতে ভালো, শুঁকতে ভালো নয়।'

সে বলল, 'তার জন্যে পান খেলেই হয়।'

আমি বললাম, 'পানটা মেয়েদের জন্যে, তামাকটা পুরুষের।

আমাদের ভোজ্য এক কিন্তু পেয় আলাদা। মেয়ে আর পুরুষের স্বভাব-চরিত্র এত বিপরীত বলেই তাদের মধ্যে বৈষ্ণব-কবিদের ভাষায় 'পীরিতি' এত বেশি।'

কথায় আমি কারো কাছে হারিনি আর স্ত্রীর কাছে হারব ঃ অন্তুতঃ তখন হারতাম না।

তারপর আমার স্ত্রীর নাকেও সিগারেটের গন্ধ সহনীয় হল। ছাই ওড়ানো সয়ে গেল চোখে। আমি তাকে বুঝিয়ে বললাম মদ খেয়ে যে মাতাল হয় না আর সিগারেট খেয়ে যে ঘর নোংরা কবে না, বিছানার চাদর আর মশারি পোড়ায় না সে ঠিক জাত নেশাখোর নয়, তার নেশা সখের নেশা। সে নেশায় সুখ নেই। আসলে সিগারেটের আগুন পুরুষের প্রেমের আগুনের প্রতীক।

সে হেসে বলেছিল, 'আর সিগারেটের ছাই?'

জবাব দিয়েছিলাম, 'সেগুলি শত্রুর মুখে দেওয়ার জন্যে।'

আমার স্ত্রী তখন আমার সব কথা মানত। কারণ আমার কথার অর্থগৌরব ছিল। শুধু কাঁচা টাকাই নয়, ভরি ভরি পাকা সোনাও দিয়েছি। তারপর আমিও দত্তাপহারী মধুসূদনের নকল করতে লাগলাম। যা দিয়েছিলাম তার সবই চেয়ে নিলাম, তার বেশি কেড়ে নিলাম। তাবপর আর নেওয়ার মত কিছু বাকি রইল না। আমার দিক থেকে দেওয়ার মত ধন, মান, যৌবন, অনেক আগেই শেষ হয়েছিল। শুধু মনকে আমার স্ত্রী আর গ্রহণযোগ্য মনে করল না। বাড়তে লাগল শুধু জন। আমাদের দুজনেরই ইচ্ছার বিরুদ্ধে। কিন্তু এসব পুরাকালের কথা বেশি বলে লাভ কি। এবার একালের কথায় আসি।

পঞ্চাশের আগেই আমি বনে ঢুকেছিলাম। সে বন আমার ঘর। সে বনের বাঘিনী আমার স্ত্রী। আর ব্যাঘ্রশাবকেরা আমাকে আস্ত একটি মোষ ছাড়া যে কিছু মনে করে না তা তাদের চোখের দিকে তাকালেই বোঝা যায়। এখন বাঘে মোষে লেগে গেলেই হয় আর কি। আমি তাই পালিয়ে পালিয়ে বেড়াতাম। কিন্তু পালাই বা

কোথায়। ঘরেও পাওনাদার বাইরেও পাওনাদার। ডাঙায় বাঘ, জলে কুমীর। আমার দিন কাটে রাস্তায় রাস্তায়, সস্তা রেস্তোরার কোণে সিগারেটের ধোঁয়ার আড়ালে। ঘরে ফিরি অনেক রাত্রে। শুধু ঘুমোবার জন্যে। সেখানে যে বিয়ের তৃতীয়দিনের মত আমার জন্যে ফুলশয্যা পাতা থাকে না তা তো বুঝতেই পার। ঝগড়া করে করে ক্লান্ত না হওয়া পর্যন্ত কারোরই ঘুম আসে না। ঘুমের যে এমন একটি মহৌষধ আছে কে জানত। ঘুম ভাঙবার পর আবার শুরু হয়। কিন্তু আলাপটা ভালো করে জমবার আগেই আমি পালাই।

সেদিন তোমার বৌদি কড়ি ছেড়ে হঠাৎ কোমল ধরল। একটু ইতস্তত করে বলল, 'দেখ, তোমার কাছে কি গোটা তিনেক টাকা হবে।

একটু অবাক হলাম। ইদানীং সে আমার কাছে কিছু চায় না। তুটি ছেলের একটি টিউশনি ফিউশনি কি যেন করে। পঞ্চাশ ষাট টাকা বোধ হয় হয়, কি তাও হয় না। সব টাকা সব মাসে আদায় করতে পারে না। ছোটটি অল্পদিন হল কলেজ ষ্ট্রীটের এক ষ্টেশনারী দোকানে সেলস্- ম্যানের কাজ নিয়ে ঢুকেছে। এখনো শিক্ষানবিশীর পালা শেষ হয়নি। ট্রাম-বাসেব খরচা বাদে বিশেষ কিছু যে ঘরে আনতে পারে মনে হয়না। টিউশনি করে মেয়েও পনেব বিশ টাকা আনে। কিন্তু মাসের পনের দিন যেতে না যেতে বারিবিন্দুর মত সবই মিলিয়ে যায়।

আমি স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে বললাম, 'টাকার কি দরকার পড়ল ?'

এমন একটি অসম্ভব প্রশ্নেও সে কিন্তু আজ চটলো না। শান্তভাবেই বলল, 'খুবই দরকার। ঘরে আজ কিছু বলতে কিছু নেই। মাছ তরকারির তো কোন কথাই ওঠে না, তু'সের চাল যে কিনব তার পর্যন্ত জো দেখছিনে। অমু-শ্যামুর কাছে যা ছিল সব ওরা ধরে দিয়েছে। হাত খরচা, বাসভাড়াটা পর্যন্ত। সব কাল ফুরিয়েছে। আজ আর কোন গতি নেই। হবে তোমার কাছে কিছু ?'

'দেখি বলে পকেটে হাত ঢুকালাম। একটি আধুলি আর একটি

পুরো জিনিস বেরিয়ে এল। পুরোন সিগারেট কেসটা। নতুন এক পার্টির সন্ধান পেয়ে আগের দিন বেশ একটু সাজসজ্জা করেই বেরিয়েছিলাম। সিগারেট ভরা কেসটি হেসে খুলে ধরেছিলাম সামনে। কিন্তু শিকার ধরতে পারিনি।

কেসে আরও কয়েকটা সিগারেট ছিল। সেগুলি বের করে নিয়ে টেবিলের ওপর রেখে কেসটা স্ত্রীর হাতে দিয়ে বললাম, 'দেখ এটা দিয়ে যদি কোন কাজ হয়।'

অনেকদিন পরে আমার স্ত্রীর মুখে এক ফোঁটা হাসি দেখলাম। ঠোঁট দুটি একেবারে শুকনো। কপালের সঙ্গে গাল-দুটোও যে এমনভাবে ভেঙেছে এতদিন চোখে পড়েনি।

আমার স্ত্রী বলল, 'পোড়া কপাল, তোমার এ সিগারেট কেস এখানে কে নেবে।'

আমি বললাম, 'আচ্ছা দাঁড়াও, দেখি কেউ নেয় কিনা।'

কেসটা তার হাত থেকে ফিরিয়ে নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। সিগারেটগুলি আর ভরে নিলাম না। দু-তিন জায়গায় চেষ্টা করবার পর এক বন্ধুর কাছ থেকে দশটাকা ধার পেলাম। কিন্তু সেও কেসটা বন্ধক রাখতে চাইল না। সে হেসে বলল, 'ওটা নিয়ে আর কী করব, ও তুমি নিয়ে যাও '

কেসটা সোনার নয়। রোল্ড-গোল্ডের। সেটা আর ফিরিয়ে নিয়ে গেলাম না। রাস্তায় ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে গেলাম।

রোজগার করা নয়, ধার করা দশটা টাকা স্ত্রীর হাতে তুলে দিলাম। তার ভাব দেখে মনে হল সে যেন হাতে স্বর্গ পেয়েছে।

একটু বাদে আমার সেই ফেলে রাখা সিগারেটগুলি একখানি রুমালে করে সে আমার সামনে এসে দাঁড়াল, বলল, 'নাও। এখনো বোধহয় নষ্ট হয়নি। আমি সঙ্গে সঙ্গে সরিয়ে রেখেছিলাম।'

আমি তার হাত থেকে সিগারেট শুদ্ধ রুমালখানা নিলাম। তারপর সে রান্নাবান্নার কাজে চলে গেলে সবাইকে লুকিয়ে জানলা দিয়ে

সিগারেটগুলি খোলা ড্রেনে ফেলে দিলাম। আরো খানিকক্ষণ বাদে আমার স্ত্রী ফের এসে দাঁড়াল। আঁচলে ভিজে হাত মুছতে মুছতে বলল, 'কী ব্যাপার, আজ যে বেরোলে না। পূবের সূর্য পশ্চিমে উঠল নাকি।'

আমি বললাম, 'উঠছে না অস্ত যাচ্ছে।'

সে বুঝতে না পেরে বলল, 'তোমার যা কথা। এই ভরদুপুরে অস্ত যাবে কি? চুপচাপ বসে আছ। সিগারেটগুলি খেয়ে শেষ করেছ নাকি?'

বললাম, 'হুঁ'।

সে বলল, 'স্মোকার বটে!' তারপর আরো কাছে এগিয়ে এসে অন্তরঙ্গ সুরে বলল, 'আমার আচলে খুচরো পয়সা আছে। আনিয়ে দেবো দুটো?'

আমি বাধা দিয়ে বললাম, 'না না, এখন না। দরকার হলে তোমাকে পরে বলব।'

সন্ধ্যার পর ছেলেরা ঘরে এল। মেয়েরাও বসল কাছে ঘেঁষে। আমাকে এ সময় ওরা পায় না, কোন্ সময়েই বা পায়?

হঠাৎ বড় মেয়ে বীথির .চোখেই প্রথম ধরা পড়ল। সে বলল, 'বাবা তুমি সিগারেট খাচ্ছ না?'

তাব মুখের দিকে তাকিয়ে হেসে বললাম, 'না মা। সিগারেট আমি ছেড়ে দিয়েছি।'

বীথি বলল, 'সে কি বাবা!'

বীথির মা বলল, 'তুমি কি রাগ করে···।'

আমি বললাম, 'রাগের তো কোন কথা হয়নি।' এর আগে মাঝে মাঝে সিগারেটের জন্য খোঁটা শুনেছি পুড়িয়ে নাকি সব ছাই করে দিলাম। কিন্তু সেদিন তো সত্যিই ওকথা কেউ বলেনি। অমু আর শ্যামুও আপত্তি করে বলল, 'এতদিনের হ্যাবিট একেবারে হঠাৎ ছেড়ে দিলে অসুখ করবে যে?'

ছোট দুই মেয়ে রিতা আর মিতা দাদাদের প্রতিধ্বনি করল, 'তোমার যে অসুখ করবে বাবা।'

অসুখ কথাটির মধ্যে যে এত সুখ ভরা কই এর আগে তো কোন-দিন ধরা পড়েনি।

আজ সাতদিন ধরে সিগারেট খাচ্ছিনে। জীবনের বাকি কটা দিনও খাবনা ঠিক করেছি। প্রথম দু'একটা দিন একটু অসুবিধা হয়েছিল। কিন্তু সে খুব সামান্য। সাঁইত্রিশ বছরের নেশা। সে তুলনায় অস্বস্তি প্রায় কিছুই হয়নি। সিগারেট খাওয়া আমি অনেক কমিয়ে এনেছিলাম। ইদানীং তো প্রায় চেয়ে চিন্তেই চলত। সিগারেটের বদলে কটা টাকাই বা বাঁচবে। নিজের স্ত্রী-পুত্রের জন্যেই এর চেয়ে বড় ত্যাগ বড় সংগ্রাম আমি করেছি।

কথাটা তা নয় কল্যাণ। সেদিন সেই সন্ধ্যায় আমার স্ত্রী আর ছেলেমেয়ের মধ্যে বসে যা আমি অনুভব করেছিলাম তার বর্ণনা করলে তুমি হাসবে। আমার সেদিন মনে হয়েছিল একটি সিগারেটের ফুলকি নিভে গিয়ে যেন আমার চোখের সামনে লক্ষ লক্ষ আশার দীপ জ্বলে উঠেছে। সেই দীপাবলী অবিচ্ছিন্ন অনির্বাণ। আমার মনে হয়েছিল যেন আমি আমার নিজের স্ত্রী-পুত্রের জন্যে সামান্য একটি নেশার বস্তু ত্যাগ করিনি, যেন পৃথিবীর সমস্ত মানুষের জন্যে যথাসর্বস্ব বিলিয়ে দিয়েছি। অন্ততঃ বিলিয়ে দিতে পারি, বিলিয়ে দেওয়া কঠিন নয়। আজ সেকথা শুনে তুমিও হাসবে, আমিও হাসি। কিন্তু সেদিনের সেই মুহূর্তটিকে একেবারে হেসে উড়িয়ে দিতে চাই না।'

ছাইদানিটি টেনে নিলেন বিজয়দা। তারপর অন্যমনস্কভাবে পকেটে হাত দিয়ে কি যেন হাতড়াতে লাগলেন। একটু বাদে খেয়াল হওয়ায় নিজেই ফের হেসে উঠে বললেন, 'দেখ কাণ্ড।'

আমি চেয়ে দেখলাম তাঁর চোখের কোণে দুফোঁটা জল গোপনে কখন যেন এসে আসন নিয়েছে।

যৎ সামান্য

রোজ না হলেও, প্রায়ই দেখা হয়। পার্কে ঢুকে দু-একবার চক্কর দিতেই দেখি মেয়েটি উল্টো দিক থেকে আস্তে আস্তে এগোচ্ছে। আমরা মুখোমুখি হই, চোখে চোখে তাকাই, তারপর যে যার পথে চলি। আমি বাঁ থেকে ডাইনে আর সে ডাইনে থেকে বাঁয়ে। কোন-কোন দিন দেখি মেয়েটি আগেই এসেছে। খানিকক্ষণ হেঁটেছে কি হাঁটেনি, পথের ধারে গাছের তলায় একটি বেঞ্চের ওপর চুপচাপ বসে রয়েছে। ও যে-বেঞ্চে বসে সে-বেঞ্চে অন্য কেউ বসে না। পুরুষ-মেয়ে কেউ না। আবার যে বেঞ্চে অন্য মেয়েরা বসে রয়েছে, এই মেয়েটি সে বেঞ্চে কোনদিন বসতে যায় না। ও নিজেই নিজের স্বাতন্ত্র্য রেখে চলে। আমার মনে হয়, পাছে কেউ ওকে ঘৃণা করে কি অবজ্ঞা অবহেলা করে সেই ভয়ে ও নিজেই সবায়ের ছোঁয়া বাঁচিয়ে দূরে সরে থাকে। এই স্পর্শকাতরতা যে কেন, মেয়েটির চেহারা দেখে আমার তা বুঝতে বাকী নেই। এই একাকিনী নিশ্চয়ই ক্ষয়রোগের রোগিণী। বয়স কত হবে মেয়েটির? কুড়ি থেকে তিরিশের মধ্যে যে-কোন অঙ্ক অনুমান করে নেওয়া যায়। ভারি রোগা ছিপছিপে চেহারা। দেহে লাবণ্য বলে কিছু নেই। বুক বালিকার মতো সমতল। লম্বাটে মুখের দুটি গালই ভাঙা। চোখদুটির সঙ্গে কোন সময় পদ্ম কি পলাশের তুলনা দেওয়া যেত কিনা জানি না, এখন সাদা দুটি বড়ির মতোই মনে হয়। মাথায় আঁচল দেয় না, কিন্তু সিঁথিতে সিঁদুর পরে। তবে রেখা খুব স্পষ্ট নয়। ওর জীবন-ধারার মতো তাও ক্ষীণ। মাথায় এখনো বেশ চুল আছে। কোনদিন দেখি পিঠে লম্বা লুটোনো বেণী। কোমর ছাড়িয়েও বেশ কিছুটা নেমেছে। কোনদিন

আলতো খোঁপা। তা এত বড় যে সারা দেহের তুলনায় বেশ একটু বেমানান দেখায়। তা দেখাক, তবু আমার ভালো লাগে। যার কিছু নেই তার চুলের এই বেমানান সমৃদ্ধিও ভালো। আমি ভাবতে চেষ্টা করি মেয়েটি যদি ওর চুলের রাশ খুলে দেয় তাহলে হয়তো ওর রোগবিকৃত রেখাকার দেহের সবখানি ঢাকা পড়বে।

গলায় সরু একগাছি হার হাতে ছ'গাছি চুড়ি। সে চুড়ি এত ঢিলে যেন এই বুঝি খুলে মাটিতে পড়ে যাবে। কানে লালপাথর-বসানো ছুটি ফুল। মনে হয় লাল রঙ মেয়েটি ভালবাসে। কারণ ওর পায়েও লাল রঙের চটি। তবে জুতো এত পুরোনো যে রঙ নিষ্প্রভ হয়ে গেছে।

একখানা শাড়ি ও অনেকদিন ধ'রে পরে। কখনো দেখি তাঁতের রঙীন শাড়ি। কখনো বা ছাপা খয়েরী রঙের ফুল ওব শুকনো দেহলতাকে চারদিক থেকে ঘিরে রাখে।

ওর দেহ আর বসন-ভূষণের যে বর্ণনা দিলাম তা আমাব একদিনে চোখে পড়েনি। ছু'বছর ধরে রোজ দেখে দেখে আমাব চোখ অভ্যস্ত হয়ে গেছে। প্রথম প্রথম ও আমার নজরেই পড়ত না। পড়লেও, আমি ওর দিকে তাকাতাম না। কারর তাকাবার মতো চেহারা তো ওর নয়। কিন্তু ক্রমে ভোববেলায় বেড়াতে এসে বোজ দেখা হতে হতে ওর আকৃতি আমার মনে মুদ্রিত হয়ে গেছে।

এই পার্কে নিত্যভ্রমণকারী আরো অনেকের সঙ্গে আমার দেখা হয়। তাঁদের সঙ্গে আলাপ-পরিচয়ও আছে। ষাট বছবের বৃদ্ধ থেকে কলেজের সেকেণ্ড-ইয়ারে-পড়া সতেরো-আঠারো বছরের ছুইটি তরুণী জয়া আর রেখা যারা এই পার্কে বেড়াতে আসে তাদের অনেকেরই আমি নাম ধাম জানি। কোন-কোন দিন সস্ত্রীক সপুত্রক ছু'একজন বন্ধুকে দেখতে পাই। নানা জনের সঙ্গে আমার নানা স্তরের আলাপ পরিচয়। কাউকে বা শুধু হাত তুলে নমস্কার করি, পার্কের ঝিল প্রদক্ষিণে কারও বা সঙ্গী হই। সাহিত্য-ব্রতী কারও সঙ্গে দেখা হলে আধুনিক গল্প কবিতা নিয়ে আলাপ চলে। কোন-

কোন বন্ধুর রাজনৈতিক হালচাল আর চাল-ডালের বাজারদর সম্বন্ধে ঔৎসুক্য বেশী। আমি লক্ষ্য করি আমার সঙ্গে আর কেউ থাকলে মেয়েটি আমার দিকে তাকায় না। কোন-কোন দিন বেড়ানো বন্ধ করে ফের তার বেঞ্চটিতে গিয়ে বসে। তারপর এক সময় উঠে চলে যায়। আমি লক্ষ্য করি আমার সঙ্গে মাঝে মাঝে যেমন আমার আত্মীয়স্বজন কি বন্ধুবান্ধব থাকে, ওর সঙ্গে তেমন কেউ থাকে না। আমি একটু যেন অস্বস্তি বোধ করি। এই মেয়েটির কি আর কেউ তেমন নেই যে ওর সঙ্গে আসতে পারে? অন্তত মাঝে মাঝে সঙ্গী হতে পারে? তেমন কাউকে দেখলে আমি যেন সঙ্কোচের হাত থেকে বেঁচে যাই। কিছুদিন বাদে বাদে আবার আমরা এমন একেকটি মুহূর্তে হঠাৎ মুখোমুখি হই যখন আর কেউ থাকে না। এক-পলকের জন্যে আমাদের চোখাচোখি হয়, তারপর আমরা ফের পাশ কাটিয়ে যাই। একেকবার পাক দিতে গিয়ে এমনি তু'বার করে আমাদের দেখা হয়ে যায়। প্রায় রোজ আমরা পরস্পরকে দেখি। তবু কেউ হাত তুলে নমস্কার করে পরিচয় স্বীকার করিনে। কাবণ আমাদেব তো আলাপ নেই। আমরা কেউ কাউকে চিনিনে, পেশায় চিনিনে, শুধু পবস্পরের মুখ চিনি। একটিমাত্র বিন্দুতে আমাদের সমস্ত আলাপ পরিচয় সীমাবদ্ধ। আমি জানি, আমি দেখি ও পার্কে বেড়াতে আসে। মেয়েটিও দেখে ভোরে বেড়ানো আমার নিত্য অভ্যাস। পরস্পরেব সম্বন্ধে আমাদের বাস্তব জ্ঞানের পরিধি মাত্র এইটুকু।

কিন্তু আমার কল্পনা আমার অনুমান পার্কের এই চক্রাকার পথটুকুর মধ্যে থেমে থাকে না। যখন আমার মনে অন্য কোন চিন্তা নেই, বাস্তব কল্পিত অন্য সব নারী-পুরুষ, বৈষয়িক অবৈষয়িক নানা ধরনের ভাবনা থেকে যখন আমার মন মুক্ত তখন আমি মুখ চেনা এই মেয়েটির কথা মাঝে মাঝে ভাবি। যার জীবনের কোন তথ্যই আমি জানিনে, এমন কি জানবার কোন আগ্রহও বোধ করিনে। যে আমার জীবনের সঙ্গে কোন দিক থেকেই যুক্ত নয়, আমার ভাবনা বেদনা প্রীতি অনুরাগ,

এমন কি সক্রিয় কোন ঔৎসুক্য কৌতূহল থেকেও মুক্ত—তার সম্বন্ধেও আমি নানারকম কল্পনা করি। নিঃসঙ্গ এই ক্ষীণাঙ্গী মেয়েটি কে? সংসারে এর কে কে আছে? আর কেউ না থাকুক, স্বামী যে আছে সিথির সিঁদুরই তার প্রমাণ। সে কি সঙ্গে থাকে, নাকি সুদূরের প্রবাসী। তার সঙ্গে কি মনের মিল আছে, নাকি দেহের অমিলের সঙ্গে মনেরও গরমিল হয়েছে? অসম্ভব কিছু না। মেয়েটি হয়তো স্বামীত্যক্তা হয়ে বাপ-ভাইএর কাছে আছে। আবার এমনও হতে পারে, ও নিজেই স্বামীত্যাগিনী। তারপর অনুতাপ অনুশোচনায় চির-রোগিণী হয়ে পড়েছে। কিংবা হয়তো এসব আমার একান্তই অনুমান। আমার যেমন স্ত্রী-পুত্র আছে, এই মেয়েটিও তেমনি নিজের ঘরে স্বামী-সন্তান-বেষ্টিতা। আমি যেমন আমার সংসারকে নিয়ে পার্কে আসিনে, মেয়েটিও হয়তো তেমনি একাই বেড়াতে আসে।

কোন কোন মুহূর্তে বুদ্‌বুদের মতো এমনি খানিকটা ঔৎসুক্য একটুখানি কৌতূহল আমার মনের মধ্যে ওঠে, তারপর আপনিই মিলিয়ে যায়। রোজ নয়, এমন কি সপ্তাহে একবারও নয়, মাসেও যে দু-একবার হয় তা বলা যায় না। হয়তো ন'মাসে ছ'মাসে হয়তো তার চেয়েও বেশীদিন অন্তর অন্তর এই তিলমাত্র জানা মেয়েটির জীবনের—তার অতীত আর ভবিষ্যতের দু'চারটি সম্ভাবনা আমার কল্পনাকে একটুমাত্র স্পর্শ করে, তারপর সেই ছোঁয়া জলে-আঁকা ছবির মতোই কখন যে মিলিয়ে যায় তা আমি টেরও পাইনে।

দিন যায় মাস যায়, বছর ঘুরে আসে। সব ঋতুতে না হোক, বর্ষায় শীতে আর বসন্তে পার্কের কিছু রূপ-পরিবর্তন চোখে পড়ে। আষাঢ়ে শ্রাবণে ঝিলের জল উছলে ওঠে। ভোরে স্নান করা যাদের অভ্যাস তারা কেউ সাঁতার কাটে। যেদিন বেশী বৃষ্টি হয়, পার্কে ঢুকবার পথে জল জমে, সেদিন আর মেয়েটিকে বেরোতে দেখিনে। ওর বড় ঠাণ্ডার ভয়। কার্তিক শুরু হতে-না-হতে ও গলায় সবুজ কম্ফোর্টার জড়িয়ে আসে। অঘ্রাণের শেষে জীর্ণ পুরোনো একটা

লংকোট পরে। বেশী শীত পড়লে আর বেরোয় না! কি যখন রোদ উঠে যায় তখন আসে। অত বেলা অবধি আমি পার্কে থাকিনে। তাই তখন ওর সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ কম হয়। তারপর ফাল্গুন-চৈত্রে গাছপালার রঙ আবার বদলায়। কৃষ্ণচূড়া গাছগুলির মাথা লাল হয়ে ওঠে। পার্কে বায়ুসেবীদের সংখ্যা বাড়ে। ছেলেমেয়েদের চালচলনে চাঞ্চল্যের মাত্রাধিক্য চোখে পড়ে।

কিন্তু এই একাকিনী রোগিনী মেয়েটির মন পৃথিবীর ঋতু বদলের সঙ্গে তাল রেখে চলে ব'লে মনে হয় না। ডাক্তারের পরামর্শে এতদিন ধরে তো বেড়াচ্ছে, কিন্তু স্বাস্থ্যের উন্নতি একেবারেই দুর্নীরিক্ষ। চোখমুখের কোনরকম পরিবর্তন কিছু হয়েছে বলে মনে হয় না। আর রোজ সাক্ষাৎ হলেও আলাপ যে কোনদিন এগোবে তেমন সম্ভাবনা নেই। অথচ আমি যদি হঠাৎ একদিন বলে বসি 'কেমন আছেন আজকাল?'—তাহলে মেয়েটি একটু বিস্মিত হলেও আকাশ থেকে পড়বে না। আমাব অনাগরিকতায় খুব যে ক্ষুণ্ণ হবে তা নয়। কিন্তু আমি সেই কুশল প্রশ্ন করিনে। আমার মনের কৌতূহল অত তীব্র নয় যাতে নাগরিক শিষ্টাচারের সীমা আমি ডিঙাতে পারি। একটি নিঃসম্পর্কীয়া অপরিচিতা রুগ্না মেয়ের সম্বন্ধে আমার মমতা কি সহানুভূতিকে কিছুতেই বেশী গভীরে নিয়ে যেতে পারিনে। আমাদের রাস্তাব দুটো গলি পশ্চিমেই সে থাকে। সেই গলির মধ্যে ওর গমন নির্গমন অনেকদিন আমার চোখে পড়েছে। ওর গলির আরও অনেককে আমি চিনি। তাদের দু-একজনকে জিজ্ঞাসা করলে হয়তো এই মেয়েটি সম্বন্ধে আমি দু-একটি তথ্য নিশ্চিতভাবে জানতে পারি। কিংবা এই পার্কে আমার যে-সব চেনা-জানা লোক বেড়াতে আসে তাদের কাউকে জিজ্ঞাসা করলেও হয়। কিন্তু অতখানি আগ্রহ আমার মধ্যে নেই। মেয়েটি যদি অসামান্যা রূপবতী হত কিংবা চেহারায় এমন কিছু বিসদৃশ বিরূপতা থাকত তাহলে শুধু আমার নয়, আমার মতো আরো অনেকেরই কৌতূহল ও জাগিয়ে তুলত। তখন

ওর নাম গোত্র আপনা থেকেই বেরিয়ে পড়ত। অনেকেই তা সংগ্রহ করে আনত। সেইসঙ্গে আমিও তা জানতে পারতাম। কিংবা এই রুগ্না মেয়েটি যদি পার্কের মধ্যে হঠাৎ আরো বেশী অসুস্থ হয়ে পড়ত, ঘাসের ওপর উপুড় হয়ে বসে দু-একবার রক্তবমি করত তাহলে ওর চার পাশে ভিড় জমে যেত, তার ফলে মেয়েটির বাপ কি স্বামীর নাম আর বাড়ির ঠিকানা জানাজানি হত। কিন্তু তাতেই বা কতটুকু আমি ওর কাছে যেতে পারতাম, কতটুকুই বা ঘনিষ্ঠভাবে জানতে পারতাম ওর জীবনকে। ধরা যাক্ ওর বাবার নাম হরিদাস চট্টোপাধ্যায়, স্বামীর নাম শিবতোষ গাঙ্গুলী, আর ওর নাম অমিতা, আর ওরা থাকে রাণী রোডে। এই তথ্যটুকু জানতে পারলেই কি আমি বিনা আলাপ-পরিচয়ে ওর বাসায় ছুটে যেতাম? সম্ভবত যেতাম না। সুতরাং ওই তিনটি নাম আমার কাছে কয়েকটি শব্দের বাহন হয়ে থাকত। তার অর্থ ধরা পড়ত না। তারপর আস্তে আস্তে আমি সেই নামগুলি ভুলে যেতাম—যেমন বহু লোকের নাম ধাম আমি জীবনে ভুলে গেছি। মেয়েটি যেমন আছে তেমনই থাক্। তার অসুস্থতা বেড়ে দরকার নেই, তার জীবনে আর কোন বিপদ না আসুক সেই ভালো।

তার চেয়ে যদি এমন হয়—এই পার্ক ছাড়া অন্য কোথাও ট্রামে বাসে দেখা হয়ে যায় মেয়েটির সঙ্গে, আমি তাহলে শুধু ওর চোখের দিকে তাকিয়ে হাসিই না একটি চেনা মুখকে সম্পূর্ণ ভিন্ন পরিবেশ দেখতে পেয়ে, হয়তো বলেও বসি 'এই যে আপনি এখানে!' ও যে-বেঞ্চে বসেছে সে-বেঞ্চের অর্ধাংশ যদি খালি থাকে তাহলে ও আমাকে নিশ্চয়ই বসতে বলে। আমি ধন্যবাদ জানিয়ে তার পাশে বসে চুপ করে অন্যদিকে তাকিয়ে থাকিনে। হয়তো আস্তে আস্তে আলাপ শুরু করি, 'আপনাকে-যে পার্কে আজ দেখলাম না?' মেয়েটি হয়তো মৃদু হেসে বলে, 'আমার আসতে একটু দেরি হয়ে গেল। আপনি তার আগেই বুঝি এসে ঘুরে গেছেন?' আমি জবাব দিই, 'হ্যাঁ, আমি খুব ভোরেই বেড়াই।' মেয়েটি হয়তো একটু প্রতিবাদের সুরে বলে, 'সব

দিনই যে ভোবে আসেন তা নয়, কোন-কোন দিন আপনাবও বেশ দেবি হয়ে যায়।'

মাত্র এইটুকুতেই আমাব আসা-যাওযা সম্বন্ধে সে যে চোখ বেখেছে এইটুকু জানতে পেবেই আমি খুশি হযে উঠি। আমাব পার্কে যেতে মাঝে মাঝে কেন দেবি হয তাকে জানাই। যখন অফিসে নাইটডিউটি থাকে তখন ভোবে একেবাবেই বেড়ানো হয়না সে-কথাও হয়তো তাকে বলি। তাবপব এমনি কবে আলাপ এগোতে থাকে। আমবা ঠিকানা বিনিময কবি। আমি তাকে আসবাব আমন্ত্রণ জানাই। সেও আমাকে যেতে বলে। সঙ্গে-সঙ্গেই হয়তো কেউ যাইনে। কিন্তু পার্কে দেখা হলে আমবা হযতো একজন আব একজনকে অনুযোগ দিই 'কই গেলেন না তো।'

মেযেটি মৃদু হেসে বলে, 'আপনিও তো এলেন না।' তাবপব থেকে দেখা হলে আমবা শুধু চোখে তাকিযে সবে যাইনে। নিশ্চযই দু-চাবটে কথাব বিনিময হয। আমবা দুজনে তাবপবে বিপবীত-মুখী হযে না-হেঁটে পাশাপাশি চলতে থাকি। মেযেটি অসুস্থ আব দুর্বল সে-কথা মনে বেখে আমি নিশ্চযই আমাব গতিবেগ কমিযে দিই আব তাব ফলে গল্প আব আলোচনাব বেগ বাড়ে। আমি তাব অনেক কথা জানতে পাবি, সে আমাব অনেক কথা বোঝে।

কিংবা এমন হয, কলকাতা ছেড়ে আবো দূবেব কোন জাযগায় পুবীব সমুদ্রতীবে আমাদেব দেখা হযে যায। আমি হেসে বলি—'আবে আপনি যে এখানে—'

সে স্মিতমুখে জবাব দেয 'ডাক্তাব জোব কবে পাঠালেন। যদিও জানি কিছুতেই কিছু হবে না।'

আমি বলি 'ও কথা কেন বলছেন। এখানে এসে আপনার শবীর বেশ ভালো হযেছে।'

তাবপব সেখানে সেই সমুদ্রেব ধাবেও আমাদের বোজ দেখা-সাক্ষাৎ হয়। মেয়েটি হয়তো কোন দূর-সম্পর্কের আত্মীয়েব বাড়িতে উঠেছে

আর আমি কম খরচের হোটেলে। কেউ কাউকে বাড়িতে ডাকিনে কিন্তু পথে রোজই দেখা হয়। কথা হয়। সকালে সন্ধ্যায় আমরা হাঁটিতে হাঁটিতে এক জায়গায় বসে পড়ি। আস্তে আস্তে অন্ধকার হয়ে আসে। তারপর সেই নীলসিন্ধুর অবিশ্রান্ত তরঙ্গধ্বনি শুনতে শুনতে একদিন সে তার জীবনের কথা বলে; বেদনার কথা বলে। যে বেদনার কোন প্রতিকার নেই, সমুদ্রের তরঙ্গলীলার সঙ্গেই শুধু যার তুলনা দেওয়া চলে। যা শুধু কান পেতে শুনতে হয়, নিঃশব্দে হৃদয় পেতে গ্রহণ করতে হয়, শুধু একজনের দুঃখকে দুজনে বসে একসঙ্গে অনুভব করা—আর কিছু না।

কী আশ্চর্য, গল্প লিখি বলেই কি কল্পনার লাগামকে এমনভাবে ছেড়ে দেওয়ার আমার অধিকার আছে? পার্কের মেয়েটির সঙ্গে শুধু পার্কেই আমার দেখা হয়। ট্রাম বাস ট্রেণ এরোপ্লেন আর-কোথাও আমরা মুখোমুখি হইনে। নাগরিক ভদ্রতার দেয়াল চীনের প্রাচীরের চেয়েও উঁচু হয়ে আমাদের মাঝখানে দাঁড়িয়ে থাকে। আমরা কেউ কারও সঙ্গে কথা বলিনে, কেউ কারও পরিচয় জানবার জন্যে আগ্রহ প্রকাশ করিনে, চেষ্টা করা তো দূরের কথা। রোজ আমাদের দেখা হয় সে শুধু মুখ দেখা মাত্র। আমাদের চেনা-শোনা যে বিন্দু থেকে শুরু করেছিল সেই বিন্দুতেই থেকে আমাদের অস্তিত্বের মহাসিন্ধুর কোন পরিচয় কেউ পাইনে।

দিন যায়, মাস যায়—বছর যায়। আমরা পরস্পরকে দেখেও দেখিনে, চিনেও চিনিনে—পাওয়ামাত্র হারিয়ে ফেলি। তাতে কোন ক্ষতি বোধ করিনে। কারণ আমার অনেক আত্মীয়স্বজন বন্ধু-বান্ধব আছে যাদের সঙ্গে আমি সরু-মোটা, সাদা রঙীন নানা সুতোয় গাঁথা। আর এই মেয়েটিরও নিশ্চয়ই তাই। ওর অনেক না থাক্, কেউ-না কেউ আছে যার সঙ্গে ওর হৃদয়ের সম্পর্ক গভীর।

একদিন চোখে পড়ল মেয়েটির সেই আলতো খোঁপায় একটি রক্তগোলাপ। দেখে খুশি হলাম। প্রসন্ন কৌতুকের হাসি আমার ঠোঁটে

ফুটে উঠল। আর আমার সেই হাসি দেখে, আমি দেখে ফেলেছি লক্ষ্য করে ওর মুখ লজ্জায় ঠিক গোলাপের মতো অবশ্য হল না, তবু একটু রক্তাভ হল। মেয়েটির সেই মুখ-ফেরানো আর হাসি-গোপন-করার ভঙ্গিটি আমি উপভোগ করলাম। এর আগে কোনদিন ওকে হাসতে দেখিনি। ওর এই হাসির মধ্যে আমার পরিচয়ের কিছু স্বীকৃতি আছে। ব্যাপার কি? ও কি তাহলে জীবনের নতুন স্বাদ পেয়েছে? ডাক্তার কি ওকে কিছু বেশী আশা-ভরসা দিয়েছে? নাকি এ শুধু প্রাণেব আশ্বাস নয়, প্রেমেরও আশ্বাস? যাকে ও হারিয়েছিল সে কি এসেছে—অন্তত আসবে বলে কথা দিয়েছে? চিঠি দিয়েছে? সেই পত্রই কি ফুল হয়ে উঠেছে ওর খোঁপায়—গোলাপ হয়ে ফুটেছে ওর মুখ!

শীতের আগে ওব সেই প্রফুল্লতা ওব সেই প্রসন্নতা আমি আরো দু'দিন দেখলাম। ভাবলাম এবার হয়তো ওর সঙ্গে কথা বলা যায়, এবার কিছু জিজ্ঞাসা করলে ও হয়তো অপরাধ নেবে না। কিন্তু ওব লজ্জা দেখে আমি শেষপর্যন্ত সঙ্কোচে পিছিয়ে গেলাম। আমি দূর থেকেই ওর এই ভাবান্তর আর রূপান্তরকে উপভোগ করলাম। কাছে গেলাম না।

কিন্তু দিনকয়েক বাদে ওর সেই বিবর্ণ মুখ আমি ফের দেখতে পেলাম। ওর সেই খোঁপার ফুল তাবও আগে ঝরে পড়েছে। পার্কে এসে ও অন্তত দু'তিনবার ঘোরে। কিন্তু আজ আর পুরো একটি পাকও দিল না। আস্তে আস্তে নেমে গিয়ে ঘাসের ওপর বসল। ঠিক একেবারে জলের ধারে। আমি ওর কাণ্ড দেখে শঙ্কিত হলাম। ব্যাপার কি? ও কি জলে ঝাঁপ দেবে? আমার মতো বায়ুসেবী কেউ কেউ ওর দিকে তাকাল। কিন্তু কেউ কাছে গেল না। আমিও গেলাম না। ঝিলের চারদিকে পাক খেতে খেতে কয়েকবার ওকে শুধু লক্ষ্য করলাম। না, ও জলে নামেনি; জলের ধারে বসে নিজের ছায়া দেখছে। আমি একটু বেশী সময় সেদিন পার্কে রইলাম। ভাবলাম ওব পাশে গিয়ে বসি। ওকে কিছু বলি। ওকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করি।

কিন্তু সাহস হল না। আমার সঙ্গে তো সত্যিই আলাপ নেই। ও যদি আমার পরিচয়কে স্বীকার না করে? যদি বিরক্ত হয়ে অপমান করে বসে? তাহলে এই পার্ক-ভরা লোকের কাছে আমি তো লজ্জা পাবই, তার চেয়ে বেশী মুখ হারাব নিজের মনের কাছে।

খানিকক্ষণ বাদে ও উঠে চলে গেল। আমি কিঞ্চিৎ নিশ্চিন্ত হয়ে বাড়ি ফিরলাম।

তার পরদিন ওকে আর পার্কে দেখলাম না। পরদিনের পরের দিন নয়, তার পরের দিনও নয়। কোনদিনই নয়। আমি আগে গিয়ে দেখলাম, পরে গিয়ে দেখলাম। কিন্তু কোনদিনই ওকে দেখতে পেলাম না।

হয়তো ওর অসুখ বেড়েছে, হয়তো এই পাড়া ছেড়ে অন্য কোথাও চলে গেছে। পার্কে আরও যারা বেড়াতে আসে তাদের কাউকে জিজ্ঞাসা করলে, একটু খোঁজখবর নিয়ে দেখলে আমি হয়তো নিশ্চিত জবাব পাই। কিন্তু আমি তা চাইনে। তা ছাড়া ওর সম্বন্ধে অতটা উৎসাহ আগ্রহ কি ঔৎসুক্য আমার নেই। প্রথম দিনের অদর্শনে যে উদ্বেগ আর বেদনাটুকু অনুভব করেছিলাম, দ্বিতীয় তৃতীয় দিনে তা মন্দীভূত হয়েছে।

আমার অনেক কাজ, অনেক চিন্তা। বাস্তবে কল্পনায় আমার অনেক আত্মীয়-স্বজন। তাদেব সুখ-দুঃখ জীবন-মৃত্যু নিয়ে আমার ভাবনার অন্ত নেই।

আজকাল পার্কে দেখা নেই মেয়েটির কথা কদাচিৎ মনে পড়ে।

একদিন আর পড়বে না।

রত্নাবাঈ

কাহিনীটি আবীরচাঁদ রূপচাঁদের আত্মজীবনাত্মক। বিভিন্ন সন্ধ্যায় বিভিন্ন প্রসঙ্গে এ কাহিনীর তিনি আভাস দিলেও প্রধানত একটি বিশেষ দিনের বৈঠকেই আমূল আখ্যানটি তাঁর কাছ থেকে জানতে পেরেছিলাম। অবশ্য শ্রুতির পুনরুদ্ধার করতে গিয়ে অন্যান্য দিনের আলাপ-আলোচনার কিছু কিছু অংশ যে এ কাহিনীর মধ্যে মিলে যায়নি এ কথা জোর ক'রে বলতে পারব না। এটুকু রূপান্তর ছাড়া আর যা অদল-বদল হয়েছে তা নিতান্তই ভাষান্তরের। তাঁর প্রাদেশিক মারাঠি-মিশ্রিত হিন্দীকে স্বকীয় ভাষায় অনুবাদ ক'রে নিয়েছি। তাতে ভঙ্গিটা একটু এদিক ওদিক হ'লেও ভাবের বিশুদ্ধতা একটুও ক্ষুণ্ণ হয়নি, এ কথা নিঃসংশয়ে বলব।

মধ্য-প্রদেশের একটি নাতিখ্যাত সহরে আবীরচাঁদ রূপচাঁদের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছিল। চাকরিতে ঢুকতে না ঢুকতেই সেই সহরের শাখা-অফিসে আমার বদলির হুকুম এল। শুনে প্রথমটা উল্লসিতই হয়েছিলাম। এ উপলক্ষে নতুন একটা জায়গা অন্তত দেখে আসা যাবে। দেখলামও। গিয়েই সপ্তাহ দুয়েকের মধ্যে অঞ্চলটির ঐতিহাসিক প্রসিদ্ধি আর নৈসর্গিক চমৎকারিত্বের নিদর্শনগুলি ঘুরে ঘুরে সব নিঃশেষ করে ফেললাম। ভাঙাচোরা যত দুর্গ আর মন্দির, হ্রদ আর জলপ্রপাত, চারদিকের ছোট বড় নানা আকারের পাহাড়ের বেষ্টনী একাধিকবার প্রত্যক্ষ করলাম। তার পর এল ক্লান্তি। মাঠ-ঘাটের সমতলে ছাড়া পাওয়ার জন্য চোখ তৃষ্ণার্ত হয়ে উঠল, মন ছটফট করতে লাগল কলকাতার স্বজন-বন্ধুদের জন্য। কিন্তু ছটফট করলে তো উপায় নেই। এ তো আর হাওয়া বদল নয় যে মনের মধ্যে

উল্টো হাওয়া বইতে সুরু করলেই গাড়িতে উঠে বসব। এমনি যখন মনের অবস্থা, আবীরচাঁদ রূপচাঁদের সঙ্গে হঠাৎ একদিন আলাপ হয়ে গেল। আলাপ এর আগেও যে কোন এক দিন হ'তে পারত। আমাদের অফিসের পাশেই তাঁর বাড়ি। শুনেছিলাম, সহরের অন্য দিকে তাঁর মারবেল পাথরের ব্যবসা আছে। এই ষাট বছরের সাধারণ-দর্শন পাথরের ব্যবসায়ীটি সম্বন্ধে আমার তেমন কোন ঔৎসুক্য ছিল না। আমার সম্বন্ধে ওঁরও যে বিশেষ কোন কৌতূহল ছিল এমন আমার মনে হয়নি। ঢুকতে-বেরুতে প্রায়ই চোখে পড়ত বারান্দায় ইজিচেয়ারে হেলান দিয়ে তিনি সামনের পাহাড়টির দিকে চেয়ে আছেন। ভ্রমণে ক্লান্তি আসার পর অফিস অন্তে আমিও বই নিয়ে চেয়ার পেতে তেতলার বারান্দায় বসতে সুরু করলাম। অফিসের ওপরতলায় আমাদের বাস ও আহারের ব্যবস্থা ছিল। পর পর তিন-চার দিন বোধ হয় তিনি আমাকে অসময়ে চুপচাপ বসে থাকতে লক্ষ্য করেছিলেন। তার পর হঠাৎ এক দিন সন্ধ্যার সময় তিনি আমাকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'বাবুজী আজকাল যে বেড়াতে বেরুচ্ছেন না ? বেড়াবার এই তো' সময়।'

বললাম, 'আর কোথায় বেড়াব। বেড়াবার মত নতুন জায়গা আর নেই, সব প্রায় দেখা-শোনা হয়ে গেছে।'

তিনি একটু হাসলেন, 'জায়গার আর দোষ কি। যে বেগে ছুটছিলেন তাতে দু' সপ্তাহে গোটা পৃথিবীও বোধ হয় দেখা হয়ে যায়, আর এ তো সামান্য একটা পাহাড়ে সহর। কিন্তু ও-ভাবে নয়, আরো ভালো ক'রে দেখুন বাবুজী। কেবল দেশ নয়, দেশের লোকজনও দেখুন, তবে তো পুরোপুরি দেখা হবে।'

উপদেশটি মামুলী বৃদ্ধজনোচিত, কিন্তু বলবার ভঙ্গিটা ভালো লাগল। হেসে বললাম, 'আপনার কথা মনে রাখব। আর দ্বিতীয় পর্যায়ের দেখাটা আমার বর্তমান প্রতিবেশীকে দিয়েই সুরু করবার ইচ্ছা রইল।'

তিনি হেসে উঠলেন, 'বহুৎ আচ্ছা, আজই আসুন না আপনি। তবে বুড়ো মানুষকে দেখতে আসা মানেই কিন্তু তাব কথা শুনতে আসা বাবুজী, তা মনে রাখবেন।'

ক্রমে আলাপ জমে উঠল। দেখলাম তিনি মিথ্যা বলেননি, কথা তিনি একটু বেশিই বলেন। তবে তাব সবই রূপকথা, উপদেশ নির্দেশ নয়। ফলে ভয়ের বদলে ভক্তি এল, রীতিমত অনুরক্ত হয়ে উঠলাম তাঁব। সময় চমৎকাব কাটতে লাগল।

তিনি চা খান না। আমিও চা ছেড়ে ভাঙেব সববৎ ধবলাম। তাবপব এ অঞ্চলেব পুবোন মন্দিবগুলিব নামেব কিংবদন্তী প্রসঙ্গে সেদিন তাঁকে কথায় বথায় জিজ্ঞাসা ক'বে বললাম, 'আচ্ছা, এত কথা তো বললেন শেঠজী কিন্তু আপনাব নামেব ইতিহাসটুকু তো কিছুই বললেন না।'

আবীবচাঁদ রূপচাঁদ একটু যেন বিস্মিত ভঙ্গিতে আমাব মুখেব দিকে তাকালেন, 'নামেব আবাব একটা ইতিহাস কি বাবুজী! এ কি কোন দুর্গেব না মন্দিবেব নাম, যে কিছু একটা কিংবদন্তী থাকবে?'

বললাম, 'নেই বুঝি? নামটি কিন্তু আপনাব সত্যিই চমৎকাব। যৌবনে বোধ হয আপনি সুপুরুষ ছিলেন।'

পলকেব জন্য আবীবচাঁদ রূপচাঁদেব দাড়ি-গোঁফ-চাঁছা কুঞ্চিত বেখাসঙ্কুল মুখে কেমন একটু ছায়া পড়ল। কিন্তু তাব পবেই তিনি সহাস্যে বললেন, 'উঁহু, তোমাব অনুমান সত্য নয় বাবুজী, এই একষট্টি বছব বয়সে রূপ আমাব সবে খুলতে সুরু কবেছে। এ ধবণেব প্রশ্ন কিন্তু তাই বলে আজ সুরু হয়নি। সাঁইত্রিশ বছব আগে আবো এক জনেব মুখে শুনেছিলাম। আমাব নাম আব নামেব অর্থ নিয়ে সে-ও উপহাস কবেছিল।'

একটু ব্যথিত হয়ে বললাম, 'আমি কিন্তু আপনাকে ঠিক উপহাস কবিনি শেঠজী।'

আবীরচাঁদ রূপচাঁদ অন্যমনস্কেব মত বললেন, 'তা জানি।'

বললাম, 'কিন্তু আমার মনে হচ্ছে, সাঁইত্রিশ বছর আগের সেই মুখ নিশ্চয়ই খুব সুন্দর ছিল। না হলে সে মুখের কথা এতদিন ধ'রে আপনি মনে করে রাখতেন না।'

আবীরচাঁদ মৃদু হাসলেন, 'এবারকার অনুমান তোমার মিথ্যা হয়নি বাবুজী। তুমি ঠিকই বলেছ। সে মুখের মত মুখ আমি জীবনে আর দেখিনি।'

বললাম, 'আপনার ভাগ্য ভালো; আপনি স্বচক্ষে দেখেছেন। আমি তো আর তেমন ভাগ্য নিয়ে আসিনি। আমাকে এ যাত্রা শুধু শুনেই সন্তুষ্ট থাকতে হবে। দোহাই আপনার, এই শোনার আনন্দটুকু থেকে আমাকে বঞ্চিত করবেন না।'

আবীরচাঁদ তেমনি স্মিত হাস্যে আমার দিকে তাকালেন, 'ভারি জবরদস্ত লোক তুমি বাবুজী! খুঁচে খুঁচে মানুষের গোপন কথা টেনে বার করতে তোমার জুড়ি নেই। আচ্ছা, শোন তা'হলে। গোড়া থেকেই বলি।'

বয়স তখন আমার কম হয়নি। চব্বিশ পেরিয়ে গেছে। সে বয়সে আমাদের সমাজে তখনকার আমলে লোকে একেবারে পাকা-পোক্ত সংসারী হয়ে বসত। ছেলে হোত, মেয়ে হোত, মান-সম্মান ধন-দৌলত তখন থেকেই দানা বাঁধতে সুরু করত। কিন্তু গোড়াতেই আমি বড় বেদারায় চলে গিয়েছিলাম বাবুজী! শুক্‌নো কেতাবের পাতায় আমার মন বসল না, বাঁধা পড়ল না বাবার কারবারের খেরো বাঁধা খাতায়, সে মন কেবলই উড়ু উড়ু করতে লাগল, কেবলই চাইল ভেসে-ভেসে বেড়াতে।

বাবা রাগ করে বললেন, 'এমন অপদার্থ আমাদের বংশে আর জন্মায়নি। ও আমার বিষয়-আশয় সব ছারখারে দেবে তবে ছাড়বে।'

মা বললেন, 'তা নয়, যেমন ভাবভঙ্গি দেখছি, এ ছেলে নিশ্চয়ই একদিন সন্ন্যাস নেবে। ভালো চাও তো বিয়ে দিয়ে এখনো আটকাও।'

বাবা শুনে শ্লেষের হাসিতে ঠোঁট বাঁকালেন। আমার তখনকার চাল-চলন স্বভাব-চরিত্র সম্বন্ধে বাবা যতখানি জানতেন, মা ততখানি বিশ্বাস করতেন না।

মা'র কোন দোষ ছিল না। ছেলে যত দিন কোলের মধ্যে আঁচলের তলায় থাকে তত দিনই মা'র তার ওপর পুরোপুরি অধিকার। তার পর আঁচলের গিঁট যেদিন খোলে, হাতের মুঠিতে ছেলেকে সেদিন আর ধরা যায় না, বুদ্ধি দিয়ে ছোঁয়া যায় না তার মন, অন্ধ-বিশ্বাস ছাড়া তাঁর আর কি সম্বল থাকে বলো?

কিন্তু বাবার শাসন, তিরস্কার আর অবিচার-অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে সন্ন্যাসী হওয়ার দিকে ঝোঁক যে এক সময় আমার না গিয়েছিল তা নয়। ঈশ্বরের কাছে নালিশ জানাবার জন্য জলভরা চোখে আকাশের দিকে তাকিয়েও ছিলাম, কিন্তু চোখ আমার আকাশ পর্যন্ত গিয়েও পৌছল না, প্রতিবেশীর বাড়ির ছাদ পর্যন্ত গিয়েই আটকে রইল। বিকালেব আলোয় দেখলাম একখানি অপূর্ব সুন্দর মুখ। চোখ জুড়িয়ে গেল। অবিচারের কথা আর মনে রইল না, অভিযোগের কথা ভুলে গেলাম।

তার পর থেকে বহু-কাল পর্যন্ত কেবল মুখ দেখে-দেখে ফিরেছি। গ্রামে গঞ্জে সহরে বন্দরে। যত দেখেছি, তত দেখবার তৃষ্ণা বেড়েছে। দেশে দেশে সে মুখের আদল বদলে গেছে, বদলেছে মুখের ভাষা। কিন্তু পৃথিবীর সব দেশের ভাষাই যে সমান মধুর তা প্রত্যেক অঞ্চলের সুন্দরী তরুণীদের মুখে না শুনলে তোমার বিশ্বাস হবে না। বিদেশিনার সঙ্গে তার নিজের ভাষায় প্রণয়ালাপের লোভে আমি বহু দুরূহ ভাষা আয়ত্ব করবার চেষ্টা করেছি। এক-আধটু ঢুঁ মেরেছিলাম তোমাদের বাংলা ভাষাতেও।

কিন্তু অনেক মুখ আর অনেক ভাষার কথা এখন থাক। একখানা মুখের কথাই আজ শোন।

রত্নাবাঈর নাম তখন উত্তর-ভারতে খুব ছড়িয়ে পড়েছে।

রাজ-রাজড়া, নবাব-বাদশার বড় বড় ঘরে তার যাতায়াত, আনাগোণা। শুনলাম, তার রূপের দ্যুতিতে চোখ ঝলসে যায়, কণ্ঠের সুর আর নূপুরের নিক্কণ একবার শুনলে কান থেকে মিলাতে চায় না। লুব্ধ ভ্রমরের মতন মন উঠল চঞ্চল হয়ে। তাকে না দেখা পর্যন্ত চিত্তে শান্তি নেই।

যোগাযোগ আর হয় না। খবর পেয়ে আগ্রায় যাই, শুনি, দল বল নিয়ে রত্নাবাঈ গেছে এলাহাবাদে। সেখানে গিয়ে শুনি গেছে কলকাতায়। কলকাতা পর্যন্ত ধাওয়া ক'রে শুনতে পাই, পূর্ববঙ্গের কোন্ এক জমিদারের বজরায় নদীতে সে ভেসে বেড়াচ্ছে।

অবশ্য জলে সে বেশি দিন রইল না। ফের উঠল ডাঙায়। লক্ষ্ণৌ সহরে এক রাও সাহেবের নাচের মজলিসে অবশেষে এক দিন তাকে দেখলাম।

তুমি হয়তো রূপের বর্ণনা শুনবার জন্য উন্মুখ হয়ে আছ বাবুজী! কিন্তু রূপ তো মুখে বর্ণনা করবার জন্য নয়, চোখে দেখবার জন্য। সেই চোখে দেখার রূপকে কতগুলি বাঁধা-ধরা শব্দে রূপান্তরিত ক'রে কতটুকু আর তোমাকে দেখাতে পারব? তার দরকারও নেই। তাকে দেখবার লোভ কোরো না, তবু তার কথা শুনে যাও। কানের ওপর তুমি অনেকখানি নির্ভর করতে পার, সে তোমাকে সহসা পাগল করবে না, মাতাল করে তুলবে না। কিন্তু চোখ? তাকে যদি তুমি একবার আস্কারা দাও বাবুজী, তোমার সমস্ত ইন্দ্রিয় অস্থির আর অশান্ত হয়ে উঠবে।

রত্নাবাঈকে দেখে আমারও তাই হোল। আসর ভাঙল অনেক রাত্রে। রাও বাহাদুরকে ঘুম পাড়াতে রত্না বাঈর আরও কিছুটা সময় লাগল। নতুন ক'রে কানে সুর ঢালল, গলায় সুরা ঢালল, অবশেষে ছুটি মিলল। আমি পিছনে পিছনে ছুটলাম গোলাপী রঙের নতুন একতালা কুঠিটায়, যেখানে তার বাসা ঠিক হয়েছে সেইখানে।

দোরের আড়ালে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখলাম, রত্নাবাঈ তার

ভারহান লঘু দেহাধার পালঙ্কে এলিয়ে দিয়েছে। পরিচারিকা পা থেকে ঘুঙুর খুলে দিচ্ছে, গা থেকে বেশবাসের বাঁধন শিথিল ক'রে দিচ্ছে। খানিক আগে যা ছিল সজ্জা, যা ছিল অলঙ্কার, এই মুহূর্তে নিতান্ত বাহুল্যের মত তা পরম অবহেলায় খসে পড়ছে।

ক্লান্তির এই অদ্ভুত রূপ আমাকে উন্মত্ত ক'রে তুলল। যে শব্দ রক্তের ঢেউয়ে আমার বুকের মধ্যে উত্তাল হয়ে উঠেছিল, দোরের করাঘাতে রত্নাবাঈ তারই প্রতিধ্বনি শুনল। পরিচারিকা অস্ফুট চীৎকার করে উঠল কিন্তু রত্নাবাঈ জ্বলন্ত মোমদানিটা তুলে নিয়ে সেই অর্ধনগ্ন বেশে আমার সামনে এসে দাঁড়াল। জ্বলন্ত মোম ফোঁটায় ফোঁটায় গলে গলে পড়তে লাগল। মনে মনে ভাবলাম, আলাদা একটা মোমবাতির দরকার ছিল কি, রত্নাবাঈ নিজেই যখন এমন করে জ্বলতে জানে।

এক মুহূর্ত আমার দিকে তাকিয়ে থেকে রত্নাবাঈ বলল, 'কে তুমি?'

বললাম, 'এই অধম রূপভিক্ষুর নাম আবীরচাঁদ রূপচাঁদ।'

'আবীরচাঁদ রূপচাঁদ!'

এক ঝলক হাসি যেন উছলে পড়ল রত্নাবাঈর পাতলা, পদ্মের পাপড়ির মত দু'টি ঠোঁটের ফাঁকে। সেই হাসির ঝলকে সুধা ছিল না। কিন্তু অঞ্জলি পেতে যদি তা ধরা যেত তাহলে দু'হাতে আমি সেই হলাহল আকণ্ঠ পান করতাম।

তার পর আমার দিকে তাকিয়ে রত্নাবাঈ জিজ্ঞাসা করল, 'এ নাম তোমার কে রেখেছে?'

দেখলাম মুখের হাসি চাপা পড়লেও কৌতুকে ব্যঙ্গে রত্নাবাঈর দু'টি চোখের হাসি তখনো উছলে পড়ছে। নিজের রূপহীন প্রতিবিম্ব রত্নাবাঈর সেই ঝকঝকে দু'চোখের আয়নায় যেন নতুন করে প্রত্যক্ষ করলাম।

বললাম, 'নাম রেখেছেন মা, মানাবে কিনা তা ভেবে দেখেননি, সে দায় তো তাঁর নয়।'

রত্নাবাঈ বলল, 'তবে কার ?'

বললাম, 'প্রিয়ার। মা শুধু নাম রাখেন, ভঙ্গি দিয়ে সুর দিয়ে সে নামের মান রাখেন প্রিয়া। নিত্য নতুন মানে জোগান।'

পরম কৌতুকে ভ্রূ দু'টি নেচে উঠল রত্নাবাঈর, 'তাই নাকি ? কিন্তু এখানে তোমার নামের সেই মানে জোগাবে কে ?'

বললাম, 'তুমি।'

হাসির ঢেউয়ে রত্নাবাঈ যেন টুকরো টুকরো হয়ে ছড়িয়ে পড়ল, 'ওলো হীরাবাঈ, দেখ এসে আমার শেষ রাতের প্রেমিক এসেছে। বেশ বেশ! এবার, দর্শনী বাবদ পঞ্চাশ গিনি গুণে দাও বন্ধু! তার পর ঘরে এস।'

বিস্মিত হয়ে বললাম, 'পঞ্চাশ।'

রত্নাবাঈ বলল, 'হ্যাঁ বন্ধু, পঞ্চাশ! তোমার ভাব দেখে মনে হচ্ছে গিনিগুলি তোমর সঙ্গে নেই। যাও নিয়ে এসো ঘর থেকে। আমি তোমার পথ চেয়ে বসে থাকব। এক রাত যদি ভোর হয় ভেবনা আরও হাজার রাত আছে। হাজার রাত যদি ভোর হয়, আছে লক্ষ রাত— '

খিল-খিল করে ফের হেসে উঠে রত্নাবাঈ দোর বন্ধ করে দিল।

অত টাকা সত্যিই সঙ্গে ছিল না, কিন্তু মনে মনে সংকল্প করলাম, যেমন করেই হোক এই পঞ্চাশ গিনি জুটিয়ে আনব। তার পর সেই গিনির মালা রত্না বাঈয়ের চোখের সামনে তুলে ধরব, সেদিন কৌতুকের বদলে লোভে তার চোখ চক্‌চক্ করবে। রুদ্ধ দ্বার খুলে যাবে। তার পর পলকের জন্য হলেও সেই সুঠাম তনু-দেহ সম্পূর্ণ আমার আয়ত্তে আসবে। তাকে নিয়ে যা খুসি করব।

ফিরে এলাম দেশে। উপার্জনের কোন বিদ্যা তখনো জানা ছিল না। বার কয়েক ক্যাস-ব্যাক্স ভাঙবার পর বাবার দোকানে কি শোবার ঘরে ঢোকবার হুকুম ছিল না তাই নিতান্ত নিরুপায় হয়েই মায়ের গয়নার

বাক্স ভাঙলাম। মা জেগে উঠে আমার হাত চেপে ধরলেন। আমার হাত তাঁর চোখের জলে ভিজে গেল, বললেন, 'এ গয়না যে তোর বউয়ের জন্য রেখেছি, আবীর!'

একবার যেন মুখে কথাটা আটকে গেল, কিন্তু পরক্ষণেই সমস্ত সংকোচ ত্যাগ করে বললাম, 'তার জন্য নিচ্ছি।'

কিন্তু ফের লক্ষ্ণৌয়ে রত্নাবাঈর আর দেখা পেলাম না। শুনলাম আবার সে কোথায় গাওনায় বেরিয়েছে। খুঁজতে বেরুলাম নতুন অধ্যবসায়ে কিন্তু কিছুতেই আর দেখা মিলল না, মাসের পর মাস কাটল, ঘুরে এল বছর। তার পর একদিন শোনা গেল, রত্নাবাঈর আর কোন উদ্দেশই পাওয়া যাচ্ছে না। কেউ বলল সন্ন্যাসিনী হয়ে সে গেছে হিমালয়ের দিকে; কেউ বলল, বাঈজী-জীবনে বিতৃষ্ণা আসায় কুলবধূ সেজে ফের অজানা গাঁয়ের পাতার ঘরে ঢুকেছে, আত্মগোপন করেছে ওড়নার আড়ালে। সর্বশেষ জনশ্রুতি, তার বুকে ব্যর্থ-প্রণয়ীর ছুরি বিঁধেছে তাকে আর ইহলোকে পাওয়া যাবে না।

শূন্য হাতে ফের ঘরে ফিরলাম। রত্নাবাঈর দেখা না মিললেও পথে-পথে ছোট-খাট মণি-মুক্তার অভাব হয়নি। মায়ের গয়না তাদের বিলিয়ে দিয়ে এলাম। ভাগ্য ভালো, ঘরে কারো কাছে কৈফিয়ৎ দিতে হোল না। ঘরে মা-কেও দেখলাম না, বাবাকেও না। শুনলাম দিন কয়েক আগে প্লেগে তাঁরা পঞ্চত্ব পেয়েছেন।

আবীরচাঁদ আমার দিকে তাকিয়ে এর পর মুহূর্ত কাল চুপ করে রইলেন। আমিও কোন কথা বললাম না।

কিন্তু পরমুহূর্তেই প্রসন্ন মৃদু হাসিটি তাঁর মুখে ফিরে আসতে দেখে আমি স্বস্তি বোধ করলাম। তিনি আবার শুরু করলেন

অবশ্য মা-বাবার মৃত্যুকে অবিশ্বাস করবার জো ছিল না। প্লেগে সে-বার সহরের বহু লোক মারা গিয়েছিল আত্মীয়-স্বজনদের কেউ কেউ তাঁদের মৃত্যুশয্যায় উপস্থিতও ছিলেন আর আমাকে এসে সান্ত্বনাও দিয়েছিলেন যে সাধ্যমত চিকিৎসার তাঁরা ত্রুটি করেননি। সুতরাং

তাঁদের মৃত্যুশোককে বেশ স্বাভাবিক ভাবেই নিতে পেরেছিলাম। কিন্তু রত্নাবাঈর মৃত্যু বিশ্বাস করিনি। বিশ্বাস করবার আমার সাধ্য ছিল না। আমার ছুরি ছাড়া আর কারো ছুরি তার বুকে বিঁধতে পারে, এ কথা কিছুতেই আমার মনঃপুত হয়নি। আমার চেয়েও বেশি ব্যর্থ-প্রণয়ী তার আর কে আছে, বেশি ধার আছে কার ছুরিতে! তাই তার অনুসন্ধানে কোন দিন আমি নিরস্ত হতে পারিনি। অবশ্য অন্য কারো মুখ দেখে তার মুখ বলে মাঝে-মাঝে যে ভুল না হয়েছে তা নয়। তার মুখ বলে ভুল হয় না এমন মুখ দেখেও মাঝে মাঝে ভুলেছি, কিন্তু রত্নাবাঈকে কোন দিনই সম্পূর্ণ বিস্মৃত হ'তে পারিনি। তার সেই আয়নার মত ঝকঝকে চোখ আমার সমস্ত পৃথিবীকে আড়াল করে দাঁড়িয়েছে। তার সেই আয়নার মত ঝকঝকে চোখ আমার সমস্ত ঠোঁট, ঠোঁটের সেই বিদ্রূপ বাঁকা রূপ, তীরের ফলার মত আমার সমস্ত জীবনকে এ-পিঠ ও-পিঠ বিদ্ধ করে রেখেছে। আমি কি করে তাকে ভুলব। তবু খুঁজে খুঁজে কিছুতেই তাকে পাওয়া গেল না। মনের মধ্যে কাঁটার মত দিনের পর দিন সে বিদ্ধ হয়ে রইল চোখেব সামনে, ফুলের মত কোন দিন ফুটে উঠল না।

বছর পনের বাদে সন্ধ্যার পরে এই ঘরেই বেশ জাঁক-জমকের সঙ্গে সেদিন গানের আর পানের অনুষ্ঠান সুরু হয়েছিল। বয়সের দিক থেকে নিজে যৌবনের শেষ প্রান্ত ছুঁই-ছুঁই করলেও মনে-প্রাণে চাল-চলনে আমি অন্য প্রান্তেই ছিলাম। সহচরদের মধ্যে সকলেই ছিল সহরের যুবা-বয়সী ধনী-সন্তান, সহচারিণীরা সবাই ছিল চারু-দর্শনা তরুণী, কেবল যে অর্থের আতিশয্যেই তারা আকৃষ্ট হোত তাই নয়, ব্যর্থতার রহস্যও আমার মধ্যে ছিল। আমার কথার চাটনি ছাড়া মদের আসর পুরোপুরি জমে উঠত না, বাঁয়া-তবলায় আমার নিজের হাতের সঙ্গত না থাকলে প্রমোদের আসরে অসঙ্গতি ধরা পড়ত।

সেদিনকার আড়ম্বরের কারণ ছিল। নাগপুর থেকে যে নতুন

তরুণী নর্তকীটিকে আনিয়েছিলাম তার নাম ছিল মণিবাঈ। তার খ্যাতি-প্রতিপত্তি এ অঞ্চলে এত প্রসিদ্ধি পেয়েছিল যে তাকে মাথার মণি করে রাখবার মত লোকের অভাব ছিল না, তবু যে সে এই ছোট্ট সহরে কিছু দিনের জন্য বাসা বাঁধতে রাজী হয়েছিল তা কেবল আমারই অলৌকিক কৃতিত্বে, এ কথা আমার সহচরেরা কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্বীকার করেছিল।

আকস্মিক পুচ্ছাহত নাগ-কন্যার অপরূপ একটি নৃত্যভঙ্গি শেষ ক'রে মণিবাঈ ক্লান্ত দেহে বিশ্রাম করতে বসল। সর্পপুচ্ছের মত তার সুদীর্ঘ বেণীটি গভীর শ্রান্তিতে পিঠের সঙ্গে লেপ্টে রয়েছে। গৌরবর্ণ মুখে মুক্তার মত দেখা যাচ্ছে বিন্দু বিন্দু স্বেদ। আসরের সবগুলি চোখ একজোড়া মুগ্ধ চোখে তাকিয়ে রয়েছে তার দিকে। মণিবাঈ মৃদু হেসে পানীয়ের জন্য ইঙ্গিত করল। সহাস্যে তার কাচের পাত্রটি রঙীন সুরায় পূর্ণ করে দিলাম। তরুণ দর্শকদের পাত্রগুলিও মদে ভরে উঠল। তারা মুহূর্তের জন্য চোখ ফিরিয়ে গ্লাসে চুমুক দিল। কেবল এক জোড়া মুগ্ধ চোখ কিছুতেই মণিবাঈয়ের মুখ থেকে সরে এল না। গ্লাস-ভরা রঙীন পানীয় বৃথাই তার সামনে টল-টল করতে লাগল।

আমি একটু হেসে আস্তে আস্তে হাত রাখলাম তার কাঁধে বললাম, 'খেয়ে নাও বন্ধু! অমন ক'রে এক-দৃষ্টে তাকিয়ো না, চোখ ঝলসে যাবে, হৃদয় ঝলসে যাবে। সে জ্বালা নিবৃত্তির একমাত্র মধু আছে এই গ্লাসের মধ্যে।'

সবাই হেসে উঠল, হাসতে লাগল মণিবাঈ। কিন্তু ততক্ষণে চমকে উঠে ছেলেটি আমার মুখের দিকে তাকিয়েছে। আর তার মুখের দিকে তাকিয়ে চমকে উঠেছি আমি। এ মুখ এ আসরে নতুন! কিন্তু এ মুখের সঙ্গে রত্নাবাঈর মুখের অবিকল মিল আছে। আমার চোখ থেকে চোখ সরিয়ে নিয়ে সে বলল, 'মাফ করবেন, মদ আমি খাই নে।'

বললাম, 'বটে! এখানে কার সঙ্গে এসেছ তুমি? নাম কি তোমার?'

বেণীপ্রসাদ এগিয়ে এল, 'অন্যায় হয়ে গেছে ওস্তাদজী। ওর সঙ্গে আগে আপনার পরিচয় করিয়ে দেওয়ার সুযোগ পাইনি। একেবারে নাচের মাঝখানে এসে পড়েছিলাম। আমি ওকে সঙ্গে করে এনেছি। ওর নাম চন্দনলাল।'

আমি বললাম, 'বেশ বেশ, দল যত ভারি হয় ততই ভালো। তা চন্দনলাল, এখানে কোথায় থাক?'

তার হয়ে বেণীপ্রসাদই জবাব দিল, 'বেশি দূরে নয়, নর্মদার তীরে ভেরিঘাট গাঁয়ের কাছাকাছি। এখানে পাঠশালায় রোজ পণ্ডিতি করতে আসে।'

বললাম, 'কিন্তু এখানে কেন, এখানকার ছাত্র-ছাত্রীরা ওঁর কাছে কি পাঠ নেবে?'

বেণীপ্রসাদ বলল, 'পণ্ডিতকে আপনার কাছেই পাঠ নেওয়ার জন্য ধরে এনেছি ওস্তাদজী। ও ভারী বোকা। কোন কোন শাস্ত্রে ওর একবারেই বর্ণ-পরিচয় নেই।'

বললাম, 'ভেব না, বর্ণজ্ঞান ইতিমধ্যেই ওর সুরু হয়েছে দেখছি।'

কথার গূঢ় ইঙ্গিতে চন্দনলালের মুখ আরক্ত হয়ে উঠল; মণিবাঈ তেমনি হাসতে লাগল মুখ টিপে টিপে।

এক ফাঁকে একান্তে ডেকে আরও একটু পরিচয় নিলাম চন্দনলালের। ওর বাবা দীর্ঘকাল সংসার ত্যাগ করে সন্ন্যাসী হয়ে গেছেন। মা আছেন ঘরে। পুণ্য-স্নান আর পূজা-অর্চনা নিয়েই থাকেন। মাতুল-সম্পত্তি পেয়ে সম্প্রতি ওরা এ অঞ্চলে এসেছে।

কিন্তু আশ্চর্য, রত্নাবাঈয়ের সঙ্গে এমন মুখের মিল ওর কি ক'রে এল? বছর কুড়ি-একুশ হবে চন্দনলালের বয়স। পনের বছর আগে রত্নাবাঈর বয়সও ঠিক এমনিই ছিল।

চন্দনকে বিদায় দেওয়ার সময় বললাম, 'এসো মাঝে-মাঝে।'

চন্দনলাল বলল, 'দয়া করে অমন অনুরোধ আমাকে করবেন না। মা যদি একবার জানতে পারেন, তিনি—'চন্দনলাল যেন শিউরে উঠল,

তার মা জানতে পারলে যে অনর্থ ঘটবে তা যেন কল্পনাতেও আনা যায় না।

চন্দনলাল বলল, 'তা ছাড়া

বললাম, 'তা ছাড়া কি?'

চন্দনলাল একটু ইতস্তত করে লজ্জিত ভঙ্গিতে বলল, 'আমাব স্ত্রী আছে ঘরে।'

হেসে উঠলাম, 'ও, তাই বলো, তাহলে তো তুমি ভাগ্যবান পুরুষ। এই বয়সেই স্ত্রীরত্ন লাভ করে বসেছ, চল্লিশ বছরেরও যা আমি পেরে উঠিনি।'

কিন্তু ঘরে নিষ্ঠাবতী মা আর সাধ্বী স্ত্রী থাকা সত্ত্বেও মণিবাঈর নাচের আসরে চন্দনলালকে তার পর দিনও দেখা গেল। মনে মনে হাসলাম। মণিবাঈর কিঙ্কিণীব ধ্বনিতে তাহলে এব মধ্যেই চন্দনলালের দুই কান ভরে উঠেছে। মায়ের উপদেশ আর স্ত্রীর অনুরোধ শুনতে হলে এখন তার তৃতীয় কর্ণের দরকার। মদের পেয়ালা চন্দনলাল আজও স্পর্শ কবল না। কিন্তু মণিবাঈর দিকে তেমনই মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে রইল। নাচের ফাঁকে ফাঁকে মণিবাঈও তার দিকে তাকাতে ভুলল না। বুঝতে পারলাম, তার সুদীর্ঘ সর্পিল বেণী চন্দনলালকে পাকে পাকে জড়িয়েছে। পরিত্রাণের আর তার পথ নেই।

আসর ভাঙলে চন্দনলালকে বললাম, 'চল তোমাকে এগিয়ে দিয়ে আসি।'

চন্দনলাল বলল, 'দরকার নেই, আমি একাই যেতে পারব।'

হেসে উঠলাম, 'অত আত্ম-প্রত্যয় ভালো নয়। চেনা পথ একবার ভুললে ফের তা চিনে পাওয়া শক্ত।'

চন্দনলাল হঠাৎ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে কঠিন সুরে জবাব দিল, 'কিন্তু পথ ভোলাবার বিদ্যাই আপনি জানেন। পথ চেনাবার সাধ্য আপনার নেই।'

পথভ্রষ্ট তরুণ-তরুণীদের এ ধরণের গালাগাল প্রায়ই আমাকে সহ্য করতে হয়। কিন্তু আমার তা গায়ে লাগে না। জানি, মনে মনে এ পথের আকর্ষণ দুর্নিবার বলে যারা টের পায় তাদেরই মুখে কটূক্তি বর্ষণের শেষ থাকে না। হেসে বললাম, 'তা হবে। তাহ'লে তুমিই চিনিয়ে নিয়ে চল। তোমাদের বাড়িটাই না হয় একবার দেখে আসি।'

চন্দনলাল রূঢ় কণ্ঠে বলল, 'আমি কি এতই নির্লজ্জ যে আপনার মত সঙ্গীকে মা'র সামনে নিয়ে উপস্থিত করব?'

বললাম, 'আচ্ছা, তাহলে থাক্। তুমিই এস মাঝে-মাঝে। তাতে বোধহয় লজ্জায় অতখানি বাধবে না।'

চন্দনলাল নরম হয়ে বলল, 'আমাকে ক্ষমা করবেন। অত্যন্ত অভদ্রতা করছি। কিন্তু আমার মা '

বললাম, 'সে জন্য অত না ভাবলেও পারতে। গায়ে এমন ক'রে নামাবলী জড়িয়ে যেতাম যে তোমার মা কিছুতেই চিনতে পারতেন না।'

পরদিন চন্দনের বাড়ির খোঁজে বেরুলাম। বাড়ি চিনতে কষ্ট হোল না। কিন্তু শুনলাম, বাড়িতে কেউ নেই। চন্দন সহরে গেছে, স্ত্রী গেছে বাপেব বাড়ি, মা নর্মদায় স্নান সেরে শিবমন্দিরে পূজা দিয়ে ফিরবে। পাহাড়ের উপর জঙ্গলের মধ্যে পোড়ো শিবমন্দির। গিয়ে দেখলাম গলায় আঁচল দিয়ে সাষ্টাঙ্গে কে একটি নারী সিঁদূর-মাখা বিগ্রহকে প্রণাম করছে। ভিজে চুলের রাশে তার দেহের সামান্যই দেখা যায়। তবু আমার মনে হোল, আমি ঠিক চিনেছি, ভুল করিনি। প্রণাম সেরে একটু পরেই সে উঠে দাঁড়াল, শ্বেত পাথরের রেকাবি তুলে নিল হাতে। ফুল-বেলপাতা সবই দেবতাকে নিবেদন করা হয়েছে। খানিকটা রক্ত-চন্দন কেবল লেগে রয়েছে রেকাবিতে।

মন্দির থেকে বেরিয়ে পাথরের সিঁড়ির প্রথম ধাপে পা দিতেই সে আমাকে সামনে দেখতে পেল; 'কে আপনি, এখানে কি চান?'

এ সেই রত্নাবাঈ। কোন সংশয় নেই তাতে। চোখের সেই

মদির উচ্ছলতা আর নেই, ঠোঁটের কোণে বাঁকা বিদ্রূপ তার অন্তর্হিত হয়েছে, কিন্তু তার সেই পদ্মের পাপড়ির মত রঙ আজো ম্লান হয়নি, তবু দেহের কোথাও এতটুকু মাত্র বিকৃত হয়নি, কঠিন তপশ্চর্যায় জরাকে সে বহু দূরে ঠেকিয়ে রেখেছে, যৌবনকে বেঁধে রেখেছে সংযমের বাঁধনে।

আজো সে দিনের মতই আত্ম-পরিচয় দিলাম, 'আমার নাম আবীরচাঁদ রূপচাঁদ।'

নাম শুনে সেদিনের মত রত্নাবাঈ আজ আর হাসির টুকরোয় ছড়িয়ে পড়ল না। উপহাসে তার চোখ উচ্ছল হোল না। কিন্তু সেই শান্ত বিষণ্ণ সুন্দর দু'টি চোখ হঠাৎ এক বিজাতীয় ঘৃণায় যেন আবিল হয়ে উঠল॥

কণ্ঠের মৃদুতায় কঠিন তিরস্কার ঢাকা পড়ল না।

বললাম, 'তা যায়। কিন্তু এ ছাড়াও আমার আর একটু পূর্ব-পরিচয় আছে।'

রত্নাবাঈ বলল, 'পূর্ব-পরিচয়! সে আবার কি?'

বললাম, 'পঞ্চাশ' গিনির অভাবে তোমার দোর একদিন আমার মুখের সামনে বন্ধ হয়ে গিয়েছিল রত্নাবাঈ। তবে ভরসা দিয়েছিলে, যদি দর্শনী সংগ্রহ করতে পারি, হাজার রাত—লক্ষ রাত ধরে তুমি আমার জন্য নাকি প্রতীক্ষা করবে। সেই পঞ্চাশ গিনির দর্শনী আজ আমি নিয়ে এসেছি রত্নাবাই, তোমার দোর এবার খোল, প্রতিজ্ঞা রাখো।'

এক অনৈসর্গিক ভয়ে রত্নাবাঈর সর্বাঙ্গ যেন থর-থর ক'রে কেঁপে উঠল। 'আপনি ভুল করছেন, আমার নাম রমাবতী। আমি চন্দনের মা। আপনি আমাকে চিনতে পারেন নি।'

রত্নাবাঈর গলা কাঁপতে লাগল।

হেসে বললাম, 'বরং তুমিই আমাকে চিনতে পারোনি রত্নাবাঈ। আমি তোমাকে কেবল নিজেই চিনেছি তা নয়, আরও অনেককে

চিনিয়ে দেওয়ার ভার নিয়েছি। সেই অনেকের মধ্যে চন্দনও থাকবে। তবে তোমার সম্মতি না পেলে হঠাৎ আমি কাজে নামব না। তুমি যদি প্রতিজ্ঞা রাখ, আমিও রাখব।'

রত্নাবাঈ বলল, 'এত হীন তুমি, এত জঘন্য! তুমি কি চাও?'

বললাম, 'সেদিনও যা চেয়েছিলাম আমি, আজও তাই চাই। আমি ভিক্ষু রত্নাবাঈ।'

রত্নাবাঈ কাঁপতে কাঁপতে ফের মন্দিরে ঢুকল, 'দূর হও—দূর হও এখান থেকে!'

তারপর সেদিনের মতই আর একবার সশব্দে দোর বন্ধ করে দিল রত্নাবাঈ।

বললাম, 'ভুল করলে রত্না, দোর তোমাকে খুলতেই হবে। কারণ পঞ্চাশ গিনির চেয়ে এবার কিছু বেশী দর্শনীই আমার হাতে এসেছে।'

বাড়ি গিয়ে মণিবাঈকে আরও মাস কয়েকের টাকা আগাম দিলাম আর বেণীপ্রসাদকে বলে দিলাম চন্দনকে খবর দিতে। শুনলাম রত্নাবাঈও তোড়-জোড় কম করেনি। পুত্রবধূ তারাবতীকে পরদিনই বাপের বাড়ি থেকে আনিয়েছে। কড়া পাহারা বসিয়েছে ছেলের চার দিকে। শিব-মন্দিরে পুজা-অর্চনার পরিমাণ বেড়ে গেছে। বেড়েছে রত্নাবাঈর উপবাস আর মন্ত্রজপের সংখ্যা।

কিন্তু রত্নাবাঈর সমস্ত আধ্যাত্মিক সাধনা আমার কাছে হার মানল। দিন কয়েক বাদে বেণীপ্রসাদের সঙ্গে ফের এল চন্দনলাল। মণিবাঈ তাকে নির্জন কক্ষে অভ্যর্থনা করল। খবর পেলাম, মদ সেদিনও চন্দন ছোঁয়নি—তবে মণিবাঈর অধর-মদিরা না কি অবশ্যই পান করছে।

খবর দেওয়ার জন্য নিজেই গেলাম রত্নাবাঈর খোঁজে। কিন্তু ঘরের কাছে যেতে না যেতেই নূপুরের ধ্বনি কানে এল। অবাকই হলাম। এ তো আমার বাড়ি নয়; তপস্বিনী রমাবতীর গৃহাঙ্গন। এখানে নূপুর বাজে কার? পা টিপে টিপে বেড়ার পাশে গিয়ে

দাঁড়ালাম। এমন দৃশ্য আমিও কল্পনা করিনি। ফের নাচের আসর বসেছে রত্নাবাঈর ঘরে। কিন্তু আজ সে নিজে নাচছে না, নাচ শিখাচ্ছে পুত্রবধূকে। তারাবতী বিস্মিত চোখে এক-এক বার শাশুড়ীর দিকে তাকাচ্ছে, তার পর ধমক খেয়ে আড়ষ্ট ভঙ্গিতে ফের নূপুর বাঁধা পা ফেলছে মাটিতে।

রত্নাবাঈ অসন্তুষ্ট ভঙ্গিতে মাথা নাড়ছে, 'হতভাগী, আরো মন দিয়ে শেখো—আরো যত্ন নাও। স্ত্রীর সেবা যে মূর্খ চাইল না, নূপুর পরা পা তুলে দাও তার কোলে। দেখ, তাতে সে ভোলে কি না।'

আশ্বস্ত হয়ে ফিরে এলাম ঘরে। শিব ফেলে রত্নাবাঈ তাহ'লে এবার অশিবের শরণ নিয়েছে। আমার পালা তাহ'লে এসেছে! এখন যে কোন এক দিন রত্নাবাঈ এসে ঘরে ঢুকলেই হয়। মণি বাঈকে বকশিষ দিয়ে বললাম, 'তোমার কাজ শেষ। আর তোমাকে বেঁধে রাখতে চাই না।'

মণিবাঈ অপূর্ব ভ্রূভঙ্গি ক'রে বলল, 'কিন্তু আমি যে বাঁধা পড়েছি।'

হেসে বললাম, 'সে তো আমার টাকায় আর চন্দনের রূপে।'

কিন্তু নেওয়ার সময় কেবল টাকাই মণিবাঈ দু'হাতে কুড়িয়ে নিল, চন্দনকে সঙ্গে নিল না। এত দিনে আমার উপদেশ চন্দনের মনে পড়ল। সুরার পাত্রে অধরের স্বাদ খুঁজতে লাগল।

তারপর একদিন সত্যিই ডাক এল রত্নাবাঈর কাছ থেকে। শিব মন্দিরে নয়, তার নির্জন শয়ন-ঘরেই। চন্দনলাল বাড়িতে ঢোকে না, অকেজো তারাবতীকে ফের বাপের বাড়ি পাঠানো হয়েছে। ঘরে শুধু আমি আর রত্নাবাঈ। অঙ্গে সামান্য আভরণ, পরনে লাল পেড়ে তসরের সাড়ি। তবু যেন রূপের অন্ত নেই। মনে হোল যেন পাথরে গড়া একখানা দেবীমূর্তি। কিন্তু আমি তো দেবতা নই। আমার রক্তে রূপের ক্ষুধা। সে রূপ পাথরের মধ্যে আমি দেখতে শিখিনি, আমার চোখে রূপময়ী শুধু রক্তমাংসের নারী। তবে তার হৃদয় বোধ হয় পাথরেরই।

তার সেই পাথরের প্রতিমা হঠাৎ আমার পায়ের ওপর ভেঙে পড়ল। ঝরণার ধারা ছুটল পাথর ভেঙে। মিনিট কয়েক নিঃশব্দে কাটল। শেষে রুদ্ধ কণ্ঠে রত্নাবাঈ বলল, 'রক্ষা করো চন্দনকে, ওকে বাঁচাও। তুমি যা চেয়েছ তাই দেব।'

আমি মুহূর্তকাল চুপ করে থেকে হঠাৎ বললাম, 'আচ্ছা সত্যিই কি পনের বছর আগে কেউ তোমার বুকে ছুরি বিঁধিয়েছিল?'

রত্নাবাঈ প্রথমে বিস্মিত হয়ে আমার দিকে তাকাল, তারপর ম্লান এক টুকরো হাসি তার সুন্দর দু'টি ঠোঁটে আভাস ফেলতে না-ফেলতেই মিলিয়ে গেল।

রত্নাবাঈ বলল, 'পনের নয় এই একুশ বছর। আজ মনে হচ্ছে বিষাক্ত ছুরিই বটে, কিন্তু সেদিন তা মনে হয়নি। সেদিন চন্দনকে পেয়ে হৃদয় আমার জুড়িয়ে গিয়েছিল, মনে হয়েছিল অমৃত-ভরা চাঁদ ধরেছি বুকে।'

কিন্তু চাঁদকে রত্নাবাঈ বেশি দিন বুকের মধ্যে রাখতে পারেনি। অনেক কষ্টে রাহুর গ্রাস থেকে রক্ষা করে তাকে দূর-সম্পর্কীয় এক বোনের হাতে পৌঁছে দিয়েছিল। চন্দনের বয়স যখন বছর পাঁচেক হঠাৎ একদিন সেই বোনের কাছ থেকে খবর এল কঠিন রোগে চন্দনের বাঁচবার আর আশা নেই। রত্না যেন তাকে শেষ দেখা দেখে আসে। ছেলের চিকিৎসায় প্রায় সমস্ত সঞ্চয় ব্যয় করল রত্নাবাঈ। তবু তার প্রাণের আশা দেখা দিল না। দিনের পর দিন অনাহারে মাথা কুটল রত্নাবাঈ শিবমন্দিরে। প্রতিজ্ঞা করল, ছেলে যদি বাঁচে আর সে ব্যবসায়ে নামবে না। সত্যের পথে—ধর্মের পথে ছেলেকে সে মানুষ ক'রে তুলবে। পরদিন সহর থেকে সব চেয়ে বড় ডাক্তার এসে বললেন, 'ভয় নেই, এত দিন ভুল চিকিৎসা হয়েছিল।' চন্দন বেঁচে উঠল, কিন্তু রত্নাবাই আর ভুল করল না। দেব মন্দিরের সেই প্রতিশ্রুতি রত্না ভাঙল না ছেলের কল্যাণের জন্য। শুধু তার মুখের দিকে চেয়ে এত দিনের খ্যাতি আর ঐশ্বর্যের পথ ছাড়ল। ছেলেকে নিয়ে অখ্যাত এক পাহাড়ী

গাঁয়ে ঘর বাঁধল। তবু একদিন কপাল ভাঙল, চন্দনের উচ্ছৃঙ্খল রক্তের মধ্যে প্রমত্তা রত্নাবাঈর যৌবনের সেই চঞ্চল নূপুরের ধ্বনি শোনা গেল।

উপকথার মত রত্নাবাঈর বিগত পনের-ষোল বছরের ইতিবৃত্ত শুনে গেলাম। তারপর রত্নাবাঈ আবার আমার মুখের দিকে তাকাল, 'তোমার যা দাবী আছে নাও, কিন্তু চন্দনকে ফিরিয়ে দাও, ওকে রক্ষা করো।'

রত্নাবাঈর চোখের কোলে মুক্তার মত ফের দুই বিন্দু অশ্রু টল-টল করে উঠল। ইচ্ছা হোল চুম্বনে চুম্বনে সেই অশ্রুর বিন্দু দুটি মুছে নিই, কিন্তু পরক্ষণে সংযত করলাম নিজেকে। শুধু চুম্বনে কি এই অতল অশ্রুর সিন্ধু শুকাবে?

বললাম, 'আচ্ছা, আজ যাই রত্নাবাঈ। তোমার উপযুক্ত দর্শনী নিয়ে আর একদিন আসব।'

আবীরচাঁদ রূপচাঁদ থামলেন, তারপর চোখ ফিরিয়ে সেই ধূসর পাহাড়টির দিকে তাকিয়ে রইলেন চুপ করে। আমার অস্তিত্বের কথা যেন তিনি সম্পূর্ণ ভুলে গেছেন।

কিছুক্ষণ আমি চুপ করে রইলাম। তারপর হঠাৎ জিজ্ঞাসা করলাম, 'শেষে কি হোল? দর্শনী কি শেঠজী শেষ পর্য্যন্ত সংগ্রহ করেছিলেন?'

আবীরচাঁদ রূপচাঁদ আমার দিকে তাকিয়ে একটু হাসলেন, 'অত কি সহজ বাবুজী? এ তো কেবল একটি বাঈজীর পঞ্চাশ গিনির দর্শনী নয়, এ দু-দুজন পুরুষের বাঁকা-চোরা বিশৃঙ্খল জীবন। নারীর দু বিন্দু অশ্রুতে তার কতটুকু প্রতিবিম্বই বা পড়ে। তবু চেষ্টা করছি। শেষ? না বাবুজী এ গল্পের আজও শেষ হয়নি।'

